রহস্যের আলো-ছায়া

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রহস্যের আলো-ছায়া

হেমেন্দ্রকুমার রায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.dlobl.org

www.boierhut.com/group

প্রথম অংশ

অপরাধের কলাকৌশল

প্রথম

অক্ষয়কুমার চৌধুরি পণ্ডিতদের একটি মস্ত বড়ো উক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছে।

পণ্ডিতরা বলেন, মানুষের মুখ হচ্ছে মনের আয়না।

লোক কেউ আছে বলে জানি না। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে পণ্ডিতদের মুখ হবে বন্ধ। কী হাসি হাসি সরল মুখ তার! সে হাসির ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে যেন সদাশয়তা আর ন্যায়পরায়ণতা! বসুধার সবাই যেন তার কুটুম্ব!

কিন্তু অক্ষয় নিজেই জানে, কেউ যদি তাকে চোর, জুয়াচোর, অসাধু বা দাগাবাজ বলে ডাকে, তবে একটুও মিথ্যা বলা হবে না।

তার ছোটো বাড়িখানিতে থাকে একটি মাত্র আধবুড়ো লোক—একাধারে সেই-ই হচ্ছে পাচক ও বেয়ারা। নাম রামচরণ। সকলের কাছেই সে বলে বেড়ায়, আমার মনিবের মতন সৎ, আমুদে আর ভালোমানুষ লোক আর দেখা যায় না। মুখে তার গান আর মিষ্টি কথা লেগেই আছে।

কিন্তু রামচরণ যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করত পারত, অক্ষয় তার মাইনের টাকা জোগাড় করে বড়ো বিদ্যা চুরিবিদ্যার দ্বারা, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডেও তার প্রকাণ্ড বিস্ময়ের স্থান সংকুলান হত না।

চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা হতে পারে, কিন্তু বিপজ্জনকও বটে। এ সত্য অক্ষয়ের অজানা ছিল না। চোরের পক্ষে কেউ নেই—বিপক্ষে সবাই।

কিন্তু অক্ষয় এও জানে, মাথা খাটাতে আর অতিলোভ সামলাতে পারলে, চুরিবিদ্যাও লাভজনক হতে পারে।

অক্ষয় অতিলোভী নয়। তার মাথাও আছে। তার দলবল নেই—সে একলা চুরি করে। তার বিরুদ্ধে কেউ রাজার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সে ঘন ঘন চুরি করে না। অনেক বুঝে-সুঝে ফন্দি এঁটে মাঝে মাঝে চুরি করে, তারপর

চোরাই মাল বেচে যে টাকা পায় তা নানাবিধ বৈধ উপায়ে খাটায়। আমাদের অক্ষয় চৌধুরি ভারী হুঁশিয়ার লোক। পুলিশ তার কাছে হার মেনেছে।

সে প্রকাশ্যে জহুরির কাজ করত। কিন্তু তার কোনও কোনও সম-ব্যবসায়ীর বিশ্বাস ছিল, অক্ষয়ের কারবার নাকি চোরাই পাথর নিয়ে। তবে এ হচ্ছে সন্দেহমাত্র। কেউ তাকে হাতেনাতে ধরতে পারেনি। কাজেই অক্ষয়ের হাসিখুসি অম্লানই আছে আজ পর্যন্ত।

সুবিধা পেলেই সে চোরাই হিরা-পান্না-মুক্তা নিয়ে কাজ গোছাতে ভোলে না।

গল্পের আরম্ভেই দেখতে পাবেন, অতি গুণধর অক্ষয় সান্ধ্যবায়ু সেবন করছে বাড়ির সামনেকার বাগানে।

এটি একটি গ্রামের বাড়ি। গ্রামের আসল নাম বলব না, আমরা চাঁদনগর নামেই ডাকব। এখান থেকে কলকাতা খুব বেশি দূরে নয়।

বাড়িতে অক্ষয় আজ একলা। রামচরণ ভিন গাঁয়ে কী কাজে গেছে, ফিরবে বেশি রাতে। অক্ষয়কে যখন তখন হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে যেতে হত, তাই সে বাড়ির সদরের চাবি করেছিল দুটি। একটি থাকত তার নিজের কাছে, আর একটি থাকত রামচরণের জিম্মায়। যে যখন আসত, তার নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়ির ভিতরে ঢুকত। আজও রামচরণ জেনেই গিয়েছে যে, রাত্রে বাড়িতে এসে সে তার মনিবকে দেখতে পাবে না। অক্ষয়কে খানিক পরেই কলকাতায় যেতে হবে। উদ্দেশ্য, খানকয় ছোটো-বড়ো হিরা বেচা। সেগুলি চোরাই বলে অক্ষয়ের মানহানি করব না। কিন্তু সে হিরাগুলি কোথায় আছে জানেন? তার জুতার গোড়ালির ভিতরে!

অবাক হবার কিছুই নেই। অক্ষয়ের একপাটি জুতার গোড়ালি হচ্ছে দেরাজের পুঁচকে সংস্করণ। কৌশলে টানলে তার একটি অংশ টানা'র মতন বেরিয়ে আসে। এই উপায়ে পকেটকাটার ও পুলিশের অন্যায় কৌতুহল জব্দ হয়।

সন্ধ্যা। বাতাসে বন্য গন্ধ, অন্ধকারের গায়ে চুমকির মতন জোনাকি। চারিদিক নিঃসাড়। অক্ষয় বাইরে যাবার পোশাক পরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখনও ট্রেনের সময় হয়নি।

হঠাৎ অদূরে রাস্তায় জাগল কার পায়ের শব্দ।

অক্ষয় ভাবতে লাগল। কোনও অতিথি আসছে নাকি? কিন্তু তার বাড়িতে অতিথি আসে তো কালেভদ্রে ...এখানে কাছাকাছি অন্য কারুর বাড়ি নেই। তার বাড়ির পরেই হচ্ছে পোড়োজমি—একটা অর্ধনির্মিত রাস্তা শেষ হয়েছে সেখানে গিয়েই। এ নতুন পথে তো গাঁয়ের লোক আসে না!

বাগানে ঢোকবার মুখেই ছিল একটি বেড়া। কৌতুহলী অক্ষয় তার উপরে ঝুঁকে ভর দিয়ে অন্ধকারের ভিতরে চোখ চালাবার চেষ্টা করলে।

অন্ধকারের বুকে জ্বলল একটা দেশলাইয়ের কাঠি, দেখা গেল একখানা মুখ, অস্পষ্ট দেহ। আগন্তুক সিগারেট ধরাচ্ছে।

অক্ষয় শুধোলে, কে?

আগন্তুক এগিয়ে এল। কাছে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলে, এই পথ দিয়ে কি মানিকপুর জংশনে যাওয়া যায়?

অক্ষয় ইংরেজিতে বললে, না; স্টেশনে যাবার অন্য রাস্তা আছে।

—আবার অন্য রাস্তা! রক্ষে করুন মশাই, যথেষ্ট হয়েছে! কে এক বোকা আমায় এমন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে, ঘুরে ঘুরে পায়ের নাড়ি ছিড়ে গেল।

—মশাইয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—কলকাতা থেকে এসেছিলুম এখানকার জমিদারবাড়িতে। যাব আবার কলকাতায়। এখন পথ হারিয়ে অন্ধের মতন ঘুরে মরছি। একে আমি চোখে খাটো, তায় এই অন্ধকার। আর পারি না!

—আপনি ক-টার ট্রেন ধরতে চান?

—সাড়ে আটটার।

—তাই নাকি? আমিও ওই ট্রেনে আজ কলকাতায় যাব। কিন্তু এখন সবে সাতটা, আমি আটটা পনেরোর আগে বাড়ি থেকে বেরুব না। আপনি যদি আমার বৈঠকখানায় এসে খানিকক্ষণ বসেন, তাহলে আমরা একসঙ্গেই স্টেশনে যেতে পারি। স্টেশন এখান থেকে আধ মাইলের বেশি হবে না।

মুখখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে চশমাপরা চোখে বাড়ির দিকে তাকিয়ে আগন্তুক কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললে, ধন্যবাদ মশাই, ধন্যবাদ!

অক্ষয় বেড়ার দরজা খুলে দিলে। আগন্তুক একটু ইতস্তত ভাব দেখালে। তারপর মুখের আধপোড়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে।

দ্বিতীয়

বৈঠকখানা অন্ধকার ছিল। অক্ষয় কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো একটা ল্যাম্পে অগ্নিসংযোগ করলে। এতক্ষণ পরে দুজনেরই দুজনকে ভালো করে দেখবার সুবিধা হল।

অক্ষয় সচমকে নিজের মনে মনে বললে, ও হরি, এ যে দেখছি জহুরি মণিলাল বুলাভাই! হুঁ, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমাকে চেনে না।

প্রকাশ্যে বললে, বসুন মশাই, আরাম করে বসুন! অনেক হাঁটাহাঁটি করেছেন, একটু চা-টা ইচ্ছা করেন?

মণিলাল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। তার পরনে কোট-পেন্টুলুন। মাথায় ধূসর রঙের নেমদার টুপি—অর্থাৎ ফেল্ট হ্যাট। সে টুপিটা ঘরের কোণে একখানা চেয়ারের উপরে রাখলে এবং হাতের ছোটো ব্যাগটা রাখলে একটা টেবিলের উপরে। ছাতাটাও তার গায়ে ঠেসিয়ে দাঁড় করিয়ে সোফার উপরে বসে পড়ল।

বৈঠকখানার একপাশে রান্নাঘর। উনুনে আগুন ছিল। চায়ের জল গরম করতে দেরি লাগল না। চা তৈরি করে অক্ষয় আবার বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। চায়ের ট্রে'-খানা টেবিলের উপরে রাখলে। একখানা থালায় দুটি রসগোল্লা ও আর একখানা থালায় খান দুই ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট দিতেও ভুললে না।

একটি তারা-কাটা দামি কাচের গেলাসে জল ঢেলে বললে, কিছু মনে করবেন না, বাড়িতে আপাতত আর কিছু খাবার খুঁজে পেলুম না।

মণিলাল বললে, সঙ্কোচের কারণ নেই। যে-দুটি খাবার দিয়েছেন, ও-দুটিই আমি ভালোবাসি'—বলেই একটি রসগোল্লা তুলে মুখের ভিতর ফেলে দিলে।

মণিলাল যে কেন জমিদারবাড়িতে গিয়েছিল, একথা জানবার জন্যে অক্ষয়ের মনে আগ্রহ হল। কিন্তু অক্ষয় এ সম্বন্ধে তাকে সরাসরি কোনও প্রশ্ন করতে ভরসা পেলে না এবং মণিলালও প্রায় নীরবেই নিজের চা ও খাবার নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইল।

অক্ষয় ভাবতে লাগল, মণিলাল বুলাভাই হচ্ছে একজন নামজাদা জহুরি। সে যখন নিজে জমিদারবাড়িতে এসেছে তখন কাজটা নিশ্চয়ই জরুরি।

কিন্তু কীরকম জরুরি...? হুঁ, বোঝা গেছে।

দিন দশ পরে জমিদারের একমাত্র মেয়ের বিয়ে! এত বড়ো ডাকসাইটে জমিদারের একমাত্র মেয়ের বিয়ে, না জানি কত হাজার টাকার জড়োয়া গহনা যৌতুক দেওয়া হবে। মণিলাল নিশ্চয়ই রাশি রাশি হিরা-চুনি-পান্নার নমুনা নিয়ে এসেছে। ওর জামার আর ওই ব্যাগের ভিতরে খুঁজলে পাওয়া যাবে হয়তো লক্ষপতির ঐশ্বর্য।

অক্ষয় ছিচকে চোর নয়। তার মূলমন্ত্র—মারি তো হাতি, লুটিতো ভাণ্ডার! সোনা-দানা সে অপছন্দ করে না বটে, কিন্তু হিরা-পান্নার দিকেই ঝোঁক তার

বেশি। হিরা-পান্না বড়ো ভালো জিনিস; ভারী নয়, মস্ত নয়, হাতের মুঠার ভিতরে লুকিয়ে রাখা যায় দস্তুর মতন সাত-রাজার ধন!

অক্ষয় ভাবতে লাগল, মণিলালের কাছে কত টাকার পাথর আছে?

মণিলাল বললে, আজ ভারী শীত পড়েছে।

অক্ষয় বললে, হ্যাঁ বড্ড। তারপর আবার ভাবতে লাগল, কত টাকার পাথর আছে? পাঁচ হাজার? দশ হাজার? ...উঁহু, তার চেয়েও বেশি! জমিদার যত টাকার পাথর কিনবেন, তাকে দেখাবার জন্য মণিলাল নিশ্চয়ই তার চেয়ে ঢের বেশি টাকার জিনিস এনেছে। নইলে ও নিজে আসত না। ওর কাছে বোধহয় পঞ্চাশ হাজার টাকার পাথর আছে!

অক্ষয় কেমন অস্থির হয়ে উঠল। নিজের অস্থিরতা ঢাকবার জন্যে বললে, আপনি ফুলের বাগান ভালোবাসেন?

মণিলাল শুষ্ক স্বরে বললে, মাঝে মাঝে পার্কে হাওয়া খেতে যাই। আমি কলকাতায় থাকি কিনা?

আবার সে বোবা। এইটেই স্বাভাবিক। অক্ষয় বুঝলে, মণিলাল বেশি কথা কইতে নারাজ, হাজার হাজার টাকার সম্পত্তি যার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, মুখরতা তার সাজে না। ...ধরলুম ওর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার পাথর আছে। পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ আধ লক্ষ টাকা! ও-টাকায় কোম্পানির কাগজ কিনলে মাসে কত টাকা আয় হয়? তার সঙ্গে যদি আমার জমানো টাকা যোগ করি—তাহলে? ওঃ, তাহলে আর আমাকে চুরি-চামারি করতে হয় না—সারাজীবন পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে বসে খেতে পারি।

অক্ষয় একবার আড়চোখে মণিলালের দিকে তাকিয়ে চট করে আবার নজর ফিরিয়ে নিলে। তার মনের ভিতরে জেগে উঠছে একটা বিশ্রী ভাব—একে দমন করতেই হবে! আমি চুরি করি বটে কিন্তু খুন? না, না, এ হচ্ছে ভয়াবহ পাগলামি! ...হ্যাঁ, একবার শ্যামবাজারের একটা পাহারাওয়ালাকে ছোরা মারতে

হয়েছিল বটে, কিন্তু সে তো হচ্ছে তার নিজেরই দোষ! তারপর হাটখোলার সেই বুড়োটা! তার মুখবন্ধ না করলে উপায় ছিল না, আমাকে দেখে সে যা ষাঁড়ের মতন চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল। এ-দুটো হচ্ছে দৈবদুর্ঘটনা—ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে কাজ করতে হয়েছিল। এজন্যে আমি নিজেও কম দুঃখিত নই। কিন্তু স্বেচ্ছায় নরহত্যা! খুন করে টাকা কেড়ে নেওয়া! উন্মত্ত না হলে এমন কাজ কেউ করে!...

তবে এ-কথাও ঠিক, আমি যদি খুনি হতুম, এমন সুযোগ আর পেতুম না। এত টাকার সম্পত্তি, খালি বাড়ি, পল্লির বাইরে নির্জন ঠাঁই, রাত্রিবেলা, ঘুটঘুটে অন্ধকার...

কিন্তু এই লাশটা খুনের পরে যত মুশকিল বাধে এই লাশ নিয়ে। লাশের গতি করা বড়ো দায়—

এমনি সময়ে হঠাৎ একখানা চলন্ত রেলগাড়ির শব্দ শোনা গেল। বাড়ির পিছনকার পোড়োজমির ওপাশ দিয়ে লাইন যেখানে মোড় ফিরে গিয়েছে, গাড়ি আসছে সেইখান দিয়ে। অক্ষয়ের মাথার ভিতর দিয়ে ধাঁ করে একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল। সেই চিন্তা সূত্র ধরে তার মন হল অগ্রসর এবং তার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল মণিলালের দিকে—সে নিজের মনেই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

অক্ষয়ের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি উঠে মণিলালের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেয়ালের বড়ো ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মন যেন বললে— অক্ষয়, শিগগির বাড়ির বাইরে পালিয়ে যাও!

যদিও অক্ষয়ের দেহ হয়ে উঠেছিল তখন উত্তপ্ত, তবু তার বুকের ভিতরে জাগল যেন শীতের কাঁপন! মাথা ঘুরিয়ে দরজার পানে তাকিয়ে সে বললে, কী কনকনে হাওয়া! আমি কি ভালো করে দরজা বন্ধ করে দিইনি? এগিয়ে গিয়ে দু-হাট করে দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারলে। তার ইচ্ছা হল দৌড়ে খোলা

বাতাসের কোলে গিয়ে পড়ে, একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়, এই আকস্মিক খ্যাপামির কবল থেকে মুক্তিলাভ করে।

বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে বললে, এইবার স্টেশনের দিকে পা চালালে কেমন হয়, তাই ভাবছি।

মণিলাল চায়ের শূন্য পেয়ালাটা রেখে দিয়ে মুখ তুলে বললে, আপনার ঘড়ি কি ঠিক?

অক্ষয় যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড় নেড়ে জানালে, হাঁ।

মণিলাল বললে, স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগবে?

—বড়ো জোর দশ মিনিট।

—এই তো সবে সাতটা-বিশ! এখনও এক ঘণ্টারও বেশি সময় আছে। বাইরের ঠান্ডা অন্ধকারের চেয়ে এ ঘর ঢের ভালো। মিছে তাড়াতাড়ি করবার দরকার আছে কি?

—কিছু না, কিছু না। —অক্ষয়ের কণ্ঠস্বর খানিক খুশি, খানিক বিষাদমাখা। আরও খানিকক্ষণ সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল—কালো রাত্রির মধ্যে দুই চোখ ডুবিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলে, নিঃশব্দে।

তারপর সে নিজের চেয়ারে বসে বাক্যব্যয়ে নারাজ মণিলালের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার কথাগুলো হল কেমন যেন বাধো-বাধো অসংলগ্ন। সে অনুভব করলে তার মুখ যেন ক্রমেই তপ্ত, তার মস্তিষ্ক যেন ক্রমেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং তার কান যেন করছে ভোঁ ভোঁ! তার চোখ যেন কী এক ভয়াবহ একাগ্রতার সঙ্গে মণিলালের দিকে নজর দিতে চায়! প্রাণপণে সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালে বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আরও ভয়ানক ভাবে আবার তার দিকেই তাকাতে বাধ্য হল এবং তার মনের ভিতরে কেরল এই প্রশ্নই চলা-ফেরা করতে লাগল—এমন অবস্থায় পড়লে অন্য কোনও খুনি কী করত, কী করত, কী

করত? ...দেখতে দেখতে সে ধীরে ধীরে প্রত্যেক দিক থেকে নিজের ভীষণ সংকল্পকে পরিপূর্ণ করে তুললে—কোনও দিকেই কোনও ছিদ্র রাখলে না।

তার মনে জাগল অস্বস্তি। মণিলালের দিকে খর-নজর রেখেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পকেটে যার অতুল ঐশ্বর্য তার সুমুখে সে আর বসে থাকতে পারলে না। সভয়ে অনুভব করলে, তার মনের ঝোঁকটা ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে। এখানে বসে থাকলে সে হঠাৎ নিজের উপরে সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলবে এবং তারপর—

তারপর যা হতে পারে সেটা ভাবতেই অক্ষয়ের সমস্ত শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল, কিন্তু সেইসঙ্গে রত্নের পুঁজি হাতাবার জন্যে তার হাত যেন নিশপিশ করতেও লাগল।

হাজার হোক, অক্ষয় অপরাধী ছাড়া কিছুই নয়। এইসব কাজেই অভ্যস্ত। সে হচ্ছে শিকারি বাঘ! সৎপথে কোনও দিন অর্থোপার্জন করেনি—তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে হিংস্র। সুতরাং এমন সহজলভ্য ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করবার প্রবৃত্তি তার হতেই পারে না। এত হিরা-পান্না তার হাতের কাছে এসেও হাত ছাড়িয়ে যাবে, এই সম্ভাবনা অক্ষয়ের চিত্তকে ক্রমেই বেপরোয়া করে তুলতে লাগল।

এই বিষম লোভের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে সে আর একবার শেষ চেষ্টা করবে স্থির করলে, যতক্ষণ না ট্রেনের সময় আসে ততক্ষণ মণিলালের সামনে থাকবে না।

অক্ষয় বললে, মশাই, আমি জামা-জুতো-কাপড় বদলে আসি। যেরকম ঠান্ডা পড়েছে, এ পোশাকে বাইরে যাওয়া উচিত নয়।

মণিলাল বললে, নিশ্চয়ই নয়। অসুখ হতে পারে।

বৈঠকখানার একপাশে ছিল দালান, ঘর থেকে বেরিয়ে অক্ষয় সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। তার জামা-কাপড় বদলাবার দরকার নেই—ওটা বাজে ওজর মাত্র।

তবু সে আনলার কাছে গিয়ে অকারণেই পোশাক পরিবর্তনে নিযুক্ত হল। ভাবলে, এইখানে দাড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাকি সময়টা কাটিয়ে দেবে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে—আশ্বস্তির! ওঃ, ও-ঘর হচ্ছে অভিশপ্ত—ওখানকার বাতাস বিষাক্ত। ওখান থেকে পালিয়ে এসে বাঁচলুম—নইলে এখনই হয়তো কী করতে গিয়ে কী করে ফেলতুম! এখানে থাকলে প্রলোভন আর আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না।

তৃতীয়

এখানে থাকলে হয়তো প্রলোভন আর আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না—হয়তো সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে মণিলাল নিজেই চলে যাবে! হ্যাঁ, সে একলা চলে গেলেই আমি খুশি হই, তাহলে সমস্ত আপদই চুকে যায়–অন্তত এই ভীষণ সুযোগ বা সম্ভাবনার দায় থেকে আমি রেহাই পাই—আর ওই হিরা-পান্নাগুলো—

একজোড়া নতুন জুতো পরতে পরতে অক্ষয় ধীরে ধীরে মাথা তুললে.....

খোলা দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে মণিলাল। কাগজ আর তামাক দিয়ে আপন মনে সে নতুন সিগারেট পাকাচ্ছে।

অক্ষয় আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তার জুতো পরা আর হল না। মণিলালের পৃষ্ঠদেশের দিকে নিস্পলক নেত্রে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইল সে মূর্তির মতো। তারপর দৃষ্টি না ফিরিয়েই পা থেকে জুতোজোড়া খুলে ফেললে!

মণিলাল নিশ্চিন্তভাবে সিগারেট পাকিয়ে তামাকের রবারের থলিটা পকেটের ভিতরে রেখে দিলে। তারপর জামার উপর থেকে তামাকের গুড়ো ঝেড়ে ফেলে দেশলাই বার করলে।

আচম্বিতে কী এক প্রবল ঝোঁকের তাড়নায় অক্ষয় চট করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং চোরের মতন গুড়ি মেরে পা টিপে টিপে বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তার পায়ে এখন জুতো নেই, কোনও শব্দ হল না। বিড়ালের মতন চুপিচুপি সে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। তার মুখ চকচকে, তার দুই চক্ষু উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত এবং নিজের কানে সে শুনতে পেলে ধমনির রক্ত-চলাচল-ধ্বনি!

মণিলাল দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালে এবং তারপর ধূমপান করতে লাগল। ধাপে ধাপে নিঃশব্দে এগিয়ে অক্ষয় গিয়ে দাঁড়াল একেবারে মণিলালের চেয়ারের পিছনে। পাছে তার নিশ্বাস মণিলালের মাথার উপরে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলে। .এইভাবে কেটে গেল আধ মিনিট! সে যেন সাক্ষাৎ হত্যার মূর্তি— বলির জীবের দিকে তাকিয়ে আছে ভয়াল প্রদীপ্ত চক্ষে, উন্মুক্ত মুখবিবর দিয়ে দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে নীরবে, দুই হাতের আঙুলগুলো যেন ধড়ফড় করছে বহুমুখ সপের মতো। তারপর আবার তেমনি নিঃশব্দেই অক্ষয় ফিরে গেল দালানের দিকে। একটা গভীর নিশ্বাস ফেললে। একটু হলেই হয়েছিল আর কী! মণিলালের জীবন ঝুলছিল একগাছা সরু সুতোর ডগায়। সত্যিকথা বলতে কী, আমি যখন চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, তখন যদি আমার হাতে কোনও অস্ত্র থাকত,—এমনকি একটা হাতুড়ি বা একখানা পাথর—

হঠাৎ অক্ষয়ের চোখ পড়ল দালানের কোণে। সেখানে দেওয়ালের কোণে দাঁড় করানো রয়েছে একটা লোহার গরাদে। বাড়ির জানলা থেকে এটা কবে খুলে পড়েছিল, ভৃত্য রামচরণ এখানে এনে রেখেছিল? ......এক মিনিট আগে এইটেই যদি আমার হাতে থাকত!

অক্ষয় লোহাগাছা তুলে নিলে। হাতের উপরে রেখে তার ভার পরীক্ষা করলে। 'হুঁ, এটা হচ্ছে দস্তুর মতো অস্ত্র, ব্যবহার করবার সময় বন্দুক বা রিভলভারের মতন চিৎকার করে পাড়া জাগায় না! আমার কার্যসিদ্ধির পক্ষে

যথেষ্ট! ...কিন্তু না, না, এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো ভালো নয়। এটাকে যথাস্থানে রেখে দেওয়াই উচিত!

কিন্তু লোহার ডান্ডা সে রেখে দিলে না। উঁকি মেরে দেখলে মণিলাল তখনও সেইভাবে বসেই সিগারেট টানছে।

আবার অক্ষয়ের ভাব-পরিবর্তন হল! আবার তার মুখ হয়ে উঠল রাঙা-টকটকে ও ভ্রুকুটি-কুটিল এবং গলার উপরে ফুলে উঠল একটা শিরা এবং পায়ে পায়ে আবার সে এগিয়ে এল বৈঠকখানার ভিতরে।

মণিলালের চেয়ার থেকে কিছু তফাতে দাঁড়িয়ে সে মাথার উপরে তুললে লোহার ডান্ডা। একটা অস্পষ্ট শব্দ হল। ডান্ডাটা যখন নীচে নামছে, মণিলাল হঠাৎ ফিরে দেখলে। তাইতেই অক্ষয়ের লক্ষ্য আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল—ডান্ডাটা মণিলালের মাথার উপরে না পড়ে একপাশ ঘেসে নেমে গেল, একটা অপেক্ষাকৃত সামান্য রকম আঘাত দিয়ে।

ভয়ার্ত বিকট চিৎকার করে মণিলাল লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং প্রাণপণে চেপে ধরল অক্ষয়ের দুই হাত।

তারপর আরম্ভ হল বিষম ধস্তাধস্তি! দুজনেই দুজনকে চেপে ধরলে সাংঘাতিক আলিঙ্গনে এবং দুজনেই কখনও দুলতে থাকে এপাশে-ওপাশে, কখনও এগিয়ে বা কখনও পিছিয়ে যায়! চেয়ার পড়ল উলটে, টেবিলের উপর থেকে ঠিকরে পড়ল একটা কাচের গেলাস, মণিলালের চশমারও হল সেই দশা, দুজনের পায়ের চাপে গেলাস ও চশমা ভেঙে গুড়িয়ে গেল।

এবং তারপরেও আরও বার-তিনেক জাগল মণিলালের সেই বিকট চিৎকার—বিদীর্ণ করে রাত্রির স্তব্ধতা! সেই উন্মাদগ্রস্ত অবস্থাতেও অক্ষয়ের বুক আতঙ্কে শিউরে উঠল। যদি কোনও পথিক দৈবগতিকে এদিকে এসে পড়ে, যদি সে শুনতে পায়?

নিজের দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে অক্ষয় তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেলে নিয়ে টেবিলের উপর ফেলে চেপে ধরলে এবং টেবিলের আচ্ছাদনের এক অংশ তুলে পুরে দিলে তার মুখের ভিতরে। এইভাবে তারা নিশ্চল হয়ে রইল পূর্ণ দুই মিনিট ধরে—সে এক ভয়াবহ নাটকীয় দৃশ্য!

দেখতে দেখতে মণিলালের দেহ পড়ল এলিয়ে, ক্রমে ক্রমে তার মাংসপেশির সমস্ত স্পন্দন থেমে গেল। তখন অক্ষয় তাকে ছেড়ে দিলে, মণিলালের জীবনহীন দেহটা মাটির উপরে এলিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

যা হবার তা হয়ে গেল। এতক্ষণ যে সম্ভাবনাকে অক্ষয় ভয় করছিল, তা পরিণত হল নিশ্চিত সত্যে! যাক, এ বিষয় নিয়ে আর অনুতাপ করা মিথ্যা! অনুতাপের দ্বারা মড়াকে আর করা যাবে না জীবন্ত।

চতুর্থ

অক্ষয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। শীতকালেও সে ঘেমে উঠেছে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ঘড়ির দিকে তাকালে।

সবে সাড়ে সাতটা!

এই ক-মিনিটের মধ্যে এতবড়ো কাণ্ড ঘটে গেল! এতক্ষণ প্রত্যেক মিনিটই ছিল যেন এক ঘণ্টার মতন দীর্ঘ।

সাড়ে সাতটা! ট্রেন আসবে সাড়ে আটটায়, হাতে সময় আছে আর একঘণ্টা! এর মধ্যেই বাকি সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তা এক ঘণ্টা সময় নিতান্ত অল্প নয়।

অক্ষয়ের ভাবভঙ্গি এখন শান্ত। তার একমাত্র দুর্ভাবনা, মণিলালের চিৎকার কেউ শুনতে পেয়েছে কি না! কেউ যদি না শুনে থাকে, তাহলে তাকে আর পায় কে!

সে হেট হয়ে মৃতব্যক্তির দাঁতের ভিতর থেটে টেবলক্লথখানা আস্তে আস্তে টেনে বার করে নিলে। তারপর তার জামাকাপড় খুঁজতে আরম্ভ করলে। বেশিক্ষণ লাগল না যা খুঁজছিল তা পেতে।

একটি ছোট্ট চামড়ার বাক্সের ভিতরে আলাদা আলাদা কাগজের মোড়কে রয়েছে হিরা, চুনি, পান্না ও মুক্ত প্রভৃতি অনেক দামি জিনিস। তাহলে তার শ্রম সার্থক! মানুষের প্রাণবধ করেছে বলে তার মনে আর কোনও রকম অনুশোচনার সঞ্চার হল না। বরং নিজেই নিজেকে দিতে লাগল অভিনন্দন।

তারপর সে সুপটু হাতে কর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত হল। টেবলক্লথের উপরে পড়েছিল কয়েক ফোটা রক্ত। লাশের মাথার তলায় কার্পেটেরও উপরে লেগেছে রক্তের ছোপ। জল ও ন্যাকড়া এনে সে আগে সাবধানে রক্ত চিহ্নগুলো ধুয়ে-মুছে ফেললে। তারপর লাশের মাথার তলায় একখানা খবরের কাগজ রেখে দিলে—নূতন রক্ত লেগে যাতে আর কার্পেট কলঙ্কিত না হয়।

তারপর টেবিল-কাপড়খানা আবার টেবিলের উপরে পেতে দিলে, উলটানো চেয়ারখানা দাঁড় করিয়ে দিলে সোজা করে।

কার্পেটের উপরে পড়েছিল একটা পায়ের চাপে চ্যাপটা সিগারেটের ধ্বংসাবশেষ ও একটা দেশলাইয়ের কাঠি। সে দুটো তুলে ছুঁড়ে দালানের দিকে ফেলে দিলে। কার্পেটের উপরে একরাশ কাচের গুড়ো পড়েছিল। সেই তারা-মার্কা গেলাসের ও মণিলালের চশমার ভাঙা কাচ। সেগুলো তুলে আগে সে একখানা কাগজের উপরে জড়ো করলে। তারপর যতদূর সম্ভব যত্ন করে বেছে বেছে চশমা-ভাঙা কাচের টুকরোগুলো আর একখানা কাগজের উপরে তুলে রাখলে। চশমার ফ্রেম ও কাচের চূর্ণগুলো মোড়কে পুরে রাখলে নিজের পকেটের

ভিতরে। যেগুলোকে গেলাসের ভাঙা কাচ বলে মনে হল, সেগুলো কাগজে করে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির খিড়কির দিকে গেল। সেখানে একটা আস্তাকুঁড় ছিল—কাগজে-মোড়া কাচগুলো তার ভিতরে ফেলে দিয়ে আবার ফিরে এল।

এইবারে আসল কাজ। টেবিলের টানার ভিতর থেকে সে একটা ফিতার কাঠিম বার করলে। খানিকটা ফিতা ছিঁড়ে নিয়ে মৃতের ছাতা ও ব্যাগটা বেঁধে নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখলে, তারপর ভূমিতল থেকে মৃতব্যক্তিকে টেনে তুললে আর এক কাঁধের উপরে। মণিলাল ছোটোখাটো মানুষ, তার দেহও ভারী নয় এবং অক্ষয় হচ্ছে দীর্ঘদেহ কৃষ্টপুষ্ট বলবান ব্যক্তি—সুতরাং তার পক্ষে বড়োজোর একমন পনেরো বা বিশ সের ওজনের একটা দেহের ভার বহন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়।

শীতার্ত অন্ধ রাত্রি—চারিদিক নিঝুম। অক্ষয় খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পোড়োজমির উপরে গিয়ে পড়ল। কুয়াশায় অন্ধকারকে যেন আরও ঘন করে তুলেছে—চোখ চেয়েও কিছু দেখা যায় না।

অক্ষয় খানিকক্ষণ কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। একটা ভীত শিয়াল বা কুকুরের দ্রুত পদশব্দ ছাড়া আর জন-প্রাণীর সাড়া পাওয়া গেল না।

অক্ষয় তখন দৃঢ়পদে অগ্রসর হল। পোড়োজমিটা এবড়ো-খেবড়ো ও কাঁকর ভরা হলেও আঁধার রাতে তার খুব অসুবিধা হল না—কারণ এ মাঠ তার বিশেষ পরিচিত।

ঘাসের উপর তার পায়ের শব্দ হচ্ছিল না বটে, কিন্তু সেই সূচীভেদ্য স্তব্ধতার মধ্যে তার কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো আর ছাতা পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে তুলছিল একটা বিরক্তিজনক আওয়াজ। মণিলালের দোদুল্যমান মৃতদেহের চেয়ে সেই ব্যাগ ও ছাতাকে সামলাবার জন্য অক্ষয়কে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল।

এই পোড়োজমির পাশেই রেললাইন। সাধারণত জমিটুকু পার হতে তিন-চার মিনিটের বেশি সময় লাগে না। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে পিঠে একটা মড়া নিয়ে অতি সাবধানে চারিদিকে চোখ ও কান রেখে, চলতে চলতে মাঝে মাঝে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে আবার অগ্রসর হতে গিয়ে অক্ষয়ের প্রায় আট-নয় মিনিট লাগল।

তারপর পাওয়া গেল রেললাইনের তারের বেড়া। আবার সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি খুঁজতে লাগল কোনও জীবন্ত ছায়া, তার কান খুঁজতে লাগল কোনও জীবনের সাড়া! কিছু নেই। খালি অন্ধকার, খালি নীরবতা।

হঠাৎ দূর থেকে জেগে উঠল চলন্ত রেলগাড়ির চাকার গড় গড় আওয়াজ—তারপর অতিতীব্র বাঁশির চিৎকার!

অক্ষয় সজাগ হয়ে উঠল—আর দেরি নয়! সে তাড়াতাড়ি তারের বেড়া পার হল। তারপর যেখানটায় লাইন বেঁকে মোড় ফিরেছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। লাশটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটির উপরে এমনভাবে উপুড় করে রাখলে, যাতে দেহের কণ্ঠদেশটা পড়ে ঠিক লাইনের উপরে।

তারপর সে পকেট থেকে ছুরি বার করে ছাতা ও ব্যাগের ফিতা কেটে ফেললে। ছাতা ও ব্যাগটাকে রাখলে ঠিক লাশের পাশে। সযত্নে ফিতাটাকে আবার পকেটে পুরলে, লাইনের কাছে পড়ে রইল কেবল ফিতার ফাঁশটুকু। সেটা তার চোখ এড়িয়ে গেল।

গাড়ির শব্দ কাছে এগিয়ে এসেছে। এ খানা নিশ্চয়ই মালগাড়ি। অক্ষয় শীঘ্রহস্তে পকেট থেকে কাগজের মোড়কটাকে বার করলে। চশমার তোবড়ানো ফ্রেমটা রেখে দিলে মৃতের মাথার পাশে। এবং কাচের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিলে তারই চতুর্দিকে!

ইঞ্জিনের ধূম্র-উদগিরণের ভোঁস ভোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে অতি নিকটে! অক্ষয়ের ইচ্ছা হল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। স্বচক্ষে দেখে যায়, যবনিক পতনের পূর্বে এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যটা—কেমন করে নরহত্যা পরিণত হয় আত্মহত্যায় বা দৈব দুর্ঘটনায়। কিন্তু না, এখানে তার উপস্থিতি নিরাপদ নয়। তাহলে হয়তো অদৃশ্য হবার আগে কেউ তাকে দেখে ফেলবে। চটপট সে আবার বেড়, পার হল, দ্রুতপদে পোড়োজমির উপর দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল—পিছনে যথাস্থানে আগতপ্রায় রেলগাড়ির বজ্রধ্বনি শুনতে শুনতে ।

রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে!

শ্বাস রুদ্ধ করে ভুপ্রোথিত মূর্তির মতন স্তম্ভিত হয়ে অক্ষয় দাঁড়িয়ে পড়ল—মুহূর্তের জন্যে। তারপর সে প্রায় দৌড়ে নিজের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। নীরবে দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলে।

সে ভয় পেয়েছে। ব্যাপার কী? গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? নিশ্চয়ই লাশটা আবিষ্কৃত হয়েছে!

কিন্তু এখন কী হচ্ছে ওখানে? ওরা কি তার বাড়িতে আসবে? রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। হয়তো এখনই কেউ এসে তার দরজার কড়া নাড়বে।

বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ে সে ব্যস্তভাবে তাকিয়ে দেখলে চারিদিকে। সমস্তই বেশ গোছালো। কিন্তু লোহার ডান্ডাটা এখনও ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে। সে ডান্ডাটা তুলে নিয়ে ল্যাম্পের আলোয় পরীক্ষা করে দেখলে। তার উপরে কোনও রক্তের দাগ নেই। কেবল দুই-এক গাছ চুল লেগে আছে।

রেলগাড়ির ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মতন সে টেবিল-কাপড় দিয়ে ডান্ডাটা একবার মুছে ফেললে।

সেটাকে নিয়ে আবার বাড়ির পিছন দিকে দৌড়ে গেল। পাঁচিলের উপর দিয়ে ডান্ডাটাকে ছুড়ে ফেলে দিলে—সেটা পড়ল গিয়ে পোড়োজমির বিছুটির ঝোপের ভিতরে।

ডান্ডাটার ভিতরে তাকে ধরিয়ে দেবার মতন কোনও প্রমাণ ছিল না। কিন্তু সেটাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে বলেই অক্ষয়ের চক্ষে তা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল।

সে বুঝলে, এইবার তার স্টেশনের দিকে যাত্রা করা উচিত। যদিও এখনও গাড়ির সময় হয়নি তবু আর বাড়ির ভিতরে থাকতে তার ভরসা হল না। সে চায় না, এখানে এসে কেউ তাকে দেখতে পায়।

অক্ষয় তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুবার আয়োজন সেরে নিলে। তারপর একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে পড়তে গেল।

কিন্তু আবার ফিরে এল, ল্যাম্পটা নিবিয়ে দেবার জন্যে। আলো নেবাবার জন্যে হাত তুলেছে—হঠাৎ তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ঘরের একদিকে। কী সর্বনাশ!

পঞ্চম

মণিলালের টুপিটা তখনও পড়ে রয়েছে চেয়ারের উপরে! তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে গেল—একেবারে আড়ষ্ট! সে মারাত্মক আতঙ্কে ঘেমে উঠল।

আর একটু হলেই তো সে আলো নিবিয়ে চলে যাচ্ছিল—পিছনে তার বিরুদ্ধে এত বড়ো প্রমাণ ফেলে রেখে! বাইরের কেউ যদি এসে এই টুপিটা এখানে দেখতে পেত, কী হত তাহলে?

চেয়ারের কাছে গিয়ে নেমদার টুপিটা তুলে নিয়ে সে তার ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করে শিউরে উঠল!

টুপিটা না দেখে চলে গেলে কি আর রক্ষে ছিল? এখনই যদি কারা এসে পড়ে, তার হাতে বা ঘরে এই টুপিটা দেখতে পায়, তাহলে কেউ তাকে ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এই কথা ভেবেই সে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু দারুণ আতঙ্কে বুদ্ধি হারালো না।

রান্নাঘরের উনুনের কাছে ছুটে গিয়ে সে দেখলে, আগুন নিবে গেছে। তখনই কতকগুলো জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে এনে অক্ষয় আবার অগ্নি সৃষ্টি করলে। তারপর ছুরি দিয়ে টুপিটা খণ্ড খণ্ড করে কেটে সমর্পণ করলে আগুনের কবলে। তার হৃৎপিণ্ড তখনও যেন দুপ দুপ করে লাফিয়ে উঠছে। যদি কেউ এসে পড়ে—যদি কেউ এসে পড়ে। তার হাতের কাপুনি যেন আর থামতেই চায় না—এখনই এত সাবধানতা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল আর কী!

নেমদা বা ফেল্ট সহজে পোড়বার জিনিস নয়। টুপির খণ্ডগুলো ধিকি-ধিকি করে আস্তে আস্তে পুড়ে প্রচুর ধোয়ার জন্ম দিয়ে অঙ্গারের মতন হয়ে যাচ্ছে—সত্যিকার ভস্মে পরিণত হচ্ছে না। তার উপরে চুল-পোড়া গন্ধের সঙ্গে রজনের গন্ধ মেশানো এমন একটা বিষম দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল যে, অক্ষয় ভয় পেয়ে রান্নাঘরের জানলাগুলো খুলে দিতে বাধ্য হল।

তখনও সে কান পেতে শুনছে আর ভাবছে, বাইরে ওই বুঝি জাগল কার পদ-শব্দ, ওই বুঝি নড়ে ওঠে সদরের কড়া, ওই বুঝি আসে নিয়তির নিষ্ঠুর আহ্বান!

ওদিকে সময়ও আর নেই। সাড়ে আটটা বাজতে বাকি আর বিশ মিনিট মাত্র! আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে না পারলে ট্রেন ধরা অসম্ভব হবে! আরও অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলে, টুপির খণ্ডগুলোকে আর চেনা যায় না। তখন সে একটা লোহার শিক নিয়ে অঙ্গারগুলোর উপরে সজোরে আঘাত করতে লাগল। পোড়া কাঠ ও কয়লার সঙ্গে টুপির দগ্ধাবশেষ নেড়ে নেড়ে

এমন করে মিশিয়ে দিলে যে, সন্দেহজনক কোনও কিছু চোখে পড়বার উপায় আর রইল না। এমনকি ভৃত্য রামচরণ পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। খুব সম্ভব সে যখন ফিরে আসবে অঙ্গার তখন ভস্মে পরিণত হবে। অক্ষয় ভালো করেই দেখে নিয়েছে, টুপির মধ্যে ধাতু দিয়ে তৈরি এমন কোনও বস্তু নেই, আগুনের কবলেও যা নষ্ট হবার নয়।

আবার সে ব্যাগ তুলে নিলে, আবার সে তীক্ষ্দৃষ্টি বুলিয়ে বৈঠকখানার চতুর্দিক পরীক্ষা করলে, তারপর ঘর ছেড়ে বাড়ির বাইরে গেল। সদর দরজার কুলুপে চাবি লাগালে। তারপর হনহন করে চলল স্টেশনের দিকে।

কিন্তু এবার সে ভুলে গেল, বৈঠকখানার আলো নিবিয়ে দিতে! ট্রেন আসবার আগেই অক্ষয় স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোল। টিকিট কিনলে। তারপর যেন নিশ্চিন্ত ভাবেই প্ল্যাটফর্মের উপরে পায়চারি করতে লাগল।

সে আড়-চোখে বেশ লক্ষ করলে, এখনও ট্রেনের সিগন্যাল দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু চারিদিকেই যেন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে গিয়ে দলবেঁধে রেললাইনের একদিকেই দূরে তাকিয়ে আছে।

সঙ্কোচ ভরা কৌতুহলের সঙ্গে অক্ষয় সেইদিকে এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। অন্ধকার ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করলে দুইজন লোক। প্ল্যাটফর্মের ঢালু প্রান্ত দিয়ে উপরে উঠে এল। তারা তেরপলে ঢাকা স্ট্রেচারে করে কী যেন বয়ে আনছে।

সেটা যে কী, তা বুঝতে অক্ষয়ের দেরি লাগল না। তার বুক করতে লাগল ছাৎ-ছাৎ।

তেরপলের তলা থেকে একটা অস্পষ্ট দেহের গঠন ফুটে উঠেছে—যাত্রীরা তাড়াতাড়ি এপাশে-ওপাশে সরে গিয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল আড়ষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ চোখে।

বাহকরা চলে গেল। পিছনে পিছনে আসছিল একটা কুলি। তার হাতে একটা ব্যাগ আর ছাতা।

হঠাৎ যাত্রীদের ভিতর থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, যে লোক কাটা পড়েছে, ওটা কি তারই ছাতা?

কুলি বললে, হাঁ বাবু! ছাতাটা সে ভদ্রলোকের চোখের সামনে তুলে ধরলে। দামি ছাতা। তার হাতলটা বিশেষ ধরনে রুপো দিয়ে বাঁধানো।

ভদ্রলোক সচমকে বলে উঠলেন, হা ভগবান! বলো কী?

তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আর একটি দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক। তিনি শুধোলেন, কেন বসন্তবাবু, আপনি এ কথা বলছেন কেন?

বসন্তবাবু বললেন, ওটা হচ্ছে মণিলাল বুলাভাইয়ের ছাতা। আমি বঁট দেখেই চিনেছি?

দ্বিতীয় অংশ

অপরাধ আবিষ্কারের কলাকৌশল

প্রথম

[*ডাক্তার দিলীপ চৌধুরির এত নামডাক ডাক্তারির জন্যে নয়। তিনি সুবিখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিদ। এবং তার আসল খ্যাতির কারণ, বিজ্ঞানের সাহয্যে বিচিত্র উপায়ে তিনি বহু কঠিন ও রহস্যপূর্ণ পুলিশ কেসের কিনারা করেছেন। শ্রীমন্ত সেন হচ্ছেন তার বিশেষ বন্ধু ও নিত্যসঙ্গী। নীচেকার অংশ শ্রীমন্ত সেনের ডায়ারি থেকে তুলে দেওয়া হল।*]

সকলেই জানেন, চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে যেখানে আইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, সেখানে পুলিশের মাথাওয়ালারা আমার বন্ধু ডাক্তার দিলীপ চৌধুরির সাহায্য লাভ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

কলকাতার বিখ্যাত জহুরি মণিলাল বুলাভাইয়ের মৃত্যুরহস্যের মধ্যে বন্ধুবর দিলীপের কৃতিত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তার ওই medico-legal পদ্ধতির কোনও কোনও বিশেষত্ব পুলিশকে খুশি করতে পারেনি। ওই বিশেষত্বগুলি যে কী, যথাস্থানে দিলীপের মুখেই তা প্রকাশ পাবে। আপাতত, কেমন করে আমরা এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম, গোড়া থেকে সেই কথাই বলব।

দিলীপ কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, আরে আরে, বসন্তবাবু যে! সঙ্গে সঙ্গে একটি সহজে-উত্তেজিত-হবার মতন চেহারার ছোটোখাটো চটপটে অথচ হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক আমাদের কামরার কাছে এসে বললেন, অ্যাঁ, দিলীপবাবু? জানলার ধারে আপনার মুখ দেখেই চিনেছি! ভারী খুশি হলুম মশাই, ভারী খুশি হলুম! কিন্তু আপনারা হচ্ছেন মস্তবড়ো বিজ্ঞ লোক, আমাকে আপদ ভাববেন না তো?

দিলীপ হেসে বললেন, আপনার দীনতা দেখে লজ্জা পাচ্ছি। কিন্তু যাক সে কথা। এখানে আপনি কী করছেন বলুন দেখি?

—আমার ছোটোভাই এখান থেকে কিছুদূরে একটা জমি কিনেছে। আমি তাই দেখতে এসেছিলুম। এই ট্রেনেই কলকাতায় ফিরব। বলেই বসন্তবাবু দরজা খুলে কামরার ভিতরে উঠে এলেন, তারপর বসে পড়ে বললেন, কিন্তু আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন? সঙ্গে ওই রহস্যময় ছোটো বাক্সটিও এনেছেন দেখছি! ও বাক্সটি দেখেই নতুন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি! আমার কাছে ওটি হচ্ছে ম্যাজিক-বাক্স!

দিলীপ বললেন, ও বাক্সটি সঙ্গে না নিয়ে আমি কখনও বাড়ির বাইরে পা বাড়াই না।

হঠাৎ কখন কী দরকার হতে পারে কে জানে? ছোটো বাক্স, বইতে কষ্ট নেই, কিন্তু দরকারের সময়ে ওটিকে হাতের কাছে না পেলে নাকালের একশেষ হতে হয়!

বাক্সের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে বসন্ত বললেন, সেই ব্যাঙ্কে খুনের মামলায় ওই বাক্স থেকে যন্ত্রপাতি বার করে আপনি যে আশ্চর্য ভেলকিবাজি দেখিয়েছিলেন, আমার এখনও মনে আছে। অদ্ভুত বাক্স, অদ্ভুত বাক্স! ওর মধ্যে কী জাদু আছে, কে জানে!

দিলীপ মৃদু হেসে সস্নেহে বাক্সটির দিকে তাকিয়ে তার ডালা খুলে ফেললেন। একরত্তি বাক্স—চৌকো একফুট মাত্র। দিলীপ এটিকে বলেন, 'আমার পকেট-রসায়নশালা এর মধ্যে খুদে খুদে যে জিনিসগুলি আছে, তার সাহায্যে যে-কোনও রাসায়নিক অনায়াসেই প্রাথমিক পরীক্ষাকার্য সম্পাদন করতে পারেন।'

'অদ্ভুত বাক্স, অদ্ভুত বাক্স!'—বলে বসন্তও মুগ্ধচোখে তার ভিতর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার ভিতরে যা কিছু আছে সব এতটুকু-এতটুকু—যেন গালিভারের ভ্রমণ কাহিনিতে বর্ণিত কড়েআঙুলের মতন ছোট্ট মানুষের দেশ

লিলিপুটে ব্যবহারযোগ্য, অথচ তার মধ্যে নেই কী? নানা রাসায়নিক তরল পদার্থে ভরা পরীক্ষক-শিশি, কাচনল, স্পিরিট-ল্যাম্প, অণুবীক্ষণ প্রভৃতি!

বসন্ত বললেন, এ যেন পুতুলখেলার বাক্স! কিন্তু মশাই, এত ছোটো ছোটো জিনিস নিয়ে কি কাজ করা যায়? ধরুন, ওই অণুবীক্ষণটি—

দিলীপ বললেন, ওটিকে খেলনার মতন দেখতে বটে, কিন্তু ওটি খেলনা নয়। ওর বীক্ষণকাচ ছোটো হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। অবশ্য বড়ো যন্ত্রে কাজের সুবিধা হয় বেশি, কিন্তু পথে-বিপথে যেখানে বড়ো যন্ত্র পাওয়া অসম্ভব, সেখানে তার অভাব এর দ্বারা যথাসম্ভব পূরণ করা চলে। এগুলি হচ্ছে মধুর অভাবে গুড়ের মতো—কিছু নেইয়ের মধ্যে তবু-কিছু?

বসন্ত হাত দিয়ে এক-একটি জিনিস তোলেন, আর বালকের মতন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। তার অসীম কৌতুহল চরিতার্থ করতে করতে গাড়ি এসে পড়ল চাঁদনগর জংশনে। বসন্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও দিলীপবাবু, এইখানেই আমাদের গাড়ি-বদল করতে হবে না?

দিলীপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ।

আমরা তিনজনেই প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লুম। এবং নেমেই বুঝলুম, এখানে কোনও অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে! যাত্রী এবং স্টেশনের লোকজনরা প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে গিয়ে সমবেত হয়েছে—চারিদিকেই যেন কেমন একটা চাপা চাঞ্চল্যের ভাব।

স্টেশনের একটি লোককে ডেকে বসন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী মশাই?

—লাইনের ওদিকে একটি লোক রেলগাড়ি চাপা পড়েছে। দূর থেকে ওই যে একটা লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে, খুব সম্ভব স্ট্রেচারে করে লাশ নিয়ে আসা হচ্ছে।

আমরা যখন সেই অন্ধকারে দোদুল্যমান আলোটার দিকে তাকিয়ে আছি, তখন টিকিটঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

লোকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দুই কারণে। প্রথমত, তার মুখ হাসিখুশিমাখা হলেও কেমন যেন বিবর্ণ এবং তার চক্ষে ছিল একটা বন্য ভাব; দ্বিতীয়ত, সাগ্রহ কৌতুহলের সঙ্গে রেললাইনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সে কারুকে কোনও প্রশ্ন করছিল না।

দুলন্ত আলোটা কাছে এগিয়ে এল। তারপর দেখা গেল, দুজন লোক তেরপলে ঢাকা একটা স্ট্রেচার নিয়ে প্লাটফর্মের ঢালু গা বেয়ে উপরে উঠে আসছে। তেরঙ্গলের তলায় যে একটা মনুষ্যদেহ আছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারলুম।

একটা ছাতা ও একটা ব্যাগ নিয়ে আসছিল একজন কুলি। বসন্তবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, যে লোক কাটা পড়েছে, ওটা কি তারই ছাতা?

কুলি ছাতাটা তুলে ধরে বললে, হাঁ বাবু!

বসন্ত সচমকে বলে উঠলেন, হা ভগবান! বলো কী?

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বসন্তবাবু, আপনি একথা বলছেন কেন?

বসন্ত বললেন, ওটা হচ্ছে মণিলাল বুলাভাইয়ের ছাতা। আমি ওর বাঁট দেখেই চিনেছি!

দিলীপ বললেন, জিহুরি মণিলাল বুলাভাই?

বসন্ত বললেন, হ্যাঁ। মণিলালের একটা অভ্যাস ছিল, টুপির তলায় নিজের নাম লিখে রাখা। ওহে বাপু কুলি, লাশের টুপিটা একবার দেখাও দেখি!

কুলি বললে, কোনও টুপি পাওয়া যায়নি। স্টেশনমাস্টার আসছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

স্টেশনমাস্টার এসে বললেন, ব্যাপার কী?

বসন্ত বললেন, এই ছাতা আর এর মালিককে আমি চিনি।

স্টেশনমাস্টার বললেন, তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে একবার আমার সঙ্গে আসুন, লাশটাও শনাক্ত করতে পারেন কি না দেখি!

বসন্ত সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ও বাবা!

—ভয় পাচ্ছেন কেন?

—রেলে কাটা পড়ে মণিলালের চেহারা কীরকম বিশ্রী হয়েছে, কে জানে!

—চেহারা মোটেই ভালো হয়নি। ছ-খানা মালগাড়ির চাকা বেচারার ওপর দিয়ে চলে যাবার আগে ড্রাইভার গাড়ি থামাতে পারেনি। ধড় থেকে মুণ্ডটা একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছে।

খাবি খেতে খেতে বসন্ত বললেন, বাপ রে, কী বীভৎস কাণ্ড! মাপ করবেন মশাই, ও-দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না। হ্যাঁ দিলীপবাবু, আপনি কী বলেন?

—আমি বলি, তাড়াতাড়ি দেহ শনাক্ত করতে পারলে পুলিশের খুব সুবিধা হয়।

বসন্ত ম্লান মুখে বললেন, তাহলে আর উপায় নেই, আমাকে দেখতেই হবে।

স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে বসন্ত একটি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন—যারপরনাই অনিচ্ছকভাবে। কিন্তু এক মিনিট যেতে না যেতেই তিনি দৌড়োতে দৌড়োতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তার মুখ-চোখ ভীত, উদভ্রান্তের মতো।

দিলীপের কাছে ছুটে এসে রুদ্ধশ্বাসে তিনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মণিলাল বুলাভাইই বটে! হায় রে বেচারা! ভয়ানক, ভয়ানক!

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, মণিলালের সঙ্গে কোনও দামি পাথর-টাথর ছিল? (এই সময়ে, একটু আগে আমি যে হাসিমুখ অথচ ছন্নছাড়ার মতো লোকটাকে লক্ষ করেছিলুম, সে একেবারে আমাদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনতে লাগল)

বসন্ত বললেন, দামি পাথর? থাকাই সম্ভব, কিন্তু আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না, তবে মণিলালের কর্মচারীরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে। ...হ্যাঁ, একটা কথা আমার রাখবেন?

—বলুন।

—যদি আপনার সময় থাকে, এই মামলাটার দিকে একটু লক্ষ রাখতে পারবেন? মণিলাল আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

—বেশ বসন্তবাবু, তাই হবে। আমার হাতে আজ আর কোনও কাজ নেই, আমি নাহয় কাল সকালেই কলকাতায় ফিরব। কী হে শ্রীমন্ত, তোমার কিছু অসুবিধা হবে না তো?

—কিছু না।

বসন্ত বললেন, ধন্যবাদ। ওই কলকাতার গাড়ি এসে পড়েছে। কাল দেখা হলে অন্য সব কথা।

—কালকেই আপনি সব খবর পাবেন। সেই যে অদ্ভুত লোকটা আমাদের কাছে ঘেসে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল, দিলীপের মুখের দিকে সে একবার অত্যন্ত উৎসুক চোখে তাকালে, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসন্তবাবুর পিছনে পিছনে কলকাতার গাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

কলকাতার গাড়ি চলে যাবার পর দিলীপ স্টেশনমাস্টারের কাছে গিয়ে জানালেন, বসন্তবাবু তার উপরে কোন ভার অর্পণ করে গিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে বললেন, অবশ্য পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমি কিছুই করব না। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে তো?

—হ্যাঁ। পুলিশ খুব শীঘ্রই এসে পড়বে। পুলিশকে আপনার কথা জানাব। স্টেশনমাস্টার এই বলে চলে গেলেন।

আমি আর দিলীপ প্ল্যাটফর্মের উপরে পদচারণা করতে লাগলুম। দিলীপ বললেন, এ ধরনের মামলায় তিন রকম ব্যাখ্যা থাকে। দৈব-দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা,

হত্যা। আর এই তিন রকম তথ্যের সিদ্ধান্ত থেকেই আমাদের একটা মীমাংসায় এসে পৌছোতে হবে। প্রথম, মামলার সাধারণ তথ্য; দ্বিতীয়, দেহ পরীক্ষা করে যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে; তৃতীয়, ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে জানা যাবে যে সত্য। আপাতত আমরা যে সাধারণ তথ্যটুকু জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই—মৃতব্যক্তি হীরক ব্যবসায়ী। নিজের ব্যাবসার জন্যেই যে সে এমন জায়গায় এসেছিল, এটুকু আমরা ধরে নিতে পারি। হয়তো তার সঙ্গে ছিল দামি দামি পাথর। এই তথ্য হচ্ছে আত্মহত্যার বিরোধী। মনে সন্দেহ আনে, হয়তো এর মধ্যে হত্যাকারীর হাত আছে। তারপর প্রশ্ন ওঠে, এটা দৈবদুর্ঘটনা কি না? তাহলে জানতে হবে, যেখানে দেহ পাওয়া গিয়েছে সেখানে কোনও লেভেলক্রসিং কি লাইনের কাছে কোনও রাস্তা আছে কি না? কিংবা ঘটনাস্থলে মৃতব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতির কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি না? এসব তথ্য এখনও আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু এগুলি আমাদের জানা উচিত।

আমি বললুম, যে কুলিটা ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে আসছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো পারো! ওই দ্যাখো, একদল লোকের কাছে দাঁড়িয়ে সে খুব-সম্ভব আজকের ঘটনাই বর্ণনা করছে। আমাদের মতন নূতন শ্রোতা পেলে তার উৎসাহ আরও বেড়ে উঠতে পারে!

লীপ বললেন, শ্রীমন্ত, তোমার কথাই শুনব। দেখা যাক ও কী বলে!

আমরা কুলিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম—সত্য-সত্যই সে গল্পের ভার নামাবার জন্যে অতিশয় উৎসুক হয়ে উঠেছে!

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা কেমন করে ঘটল বলতে পারে!

সে বললে, ড্রাইভার যা বললে তা আমি শুনেছি। ওখানে এক জায়গায় লাইনটা বেঁকে গিয়েছে। মালগাড়ি যখন সেই বাঁকের মুখে এসে পড়ে, ড্রাইভার তখন হঠাৎ দেখতে পায়, লাইনের উপরে কী যেন পড়ে আছে! তারপর ইঞ্জিনের হেড লাইটে দেখা যায়, একজন মানুষ সেখানে শুয়ে আছে। সে তখনই বাষ্প

বন্ধ করে দেয়, বাঁশি বাজায় আর ব্রেক কষে। কিন্তু জানেন তো মশাই, এত তাড়াতাড়ি মালগাড়ি থামানো সোজা ব্যাপার নয়। থমবার আগেই ছ খানা গাড়ি লোকটার উপর দিয়ে গড়গড় করে চলে যায়!

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটা কীভাবে শুয়েছিল, ড্রাইভার সে কথা কিছু বলেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হেডলাইটে সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, লোকটা লাইনের ওপর গলা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। লোকটা ইচ্ছে করেই প্রাণ দিয়েছে মশাই!

—সেখানে কোনও লেভেলক্রসিং ছিল?

—না বাবু। সেখানে কোনও রাস্তা-টাস্তাও ছিল না। লোকটা নিশ্চয়ই মাঠের ভেতর দিয়ে এসে, তারের বেড়া টপকে লাইনের ওপরে এসেছিল। সে আত্মঘাতী হবে বলে পণ করেছিল।

—এত কথা তুমি জানলে কেমন করে?

—স্টেশনমাস্টার আমাকে বলেছেন।

দিলীপের সঙ্গে আমি ফিরে এসে একখানা বেঞ্চির উপরে বসে পড়লুম।

দিলীপ বললেন, একদিক দিয়ে লোকটার কথা খুব ঠিক। এটা দৈবদুর্ঘটনা নয়। তবে লোকটা যদি রাতকানা, কালা বা নির্বোধও হত, হয়তো বেড়া ডিঙিয়ে লাইনে নেমে মারা পড়তেও পারত। কিন্তু মণিলাল বুলাভাই সে-শ্রেণির লোক নয়। মণিলাল লাইনের উপরে গলা দিয়ে শুয়েছিল। এথেকেও আমরা দু-একটা অনুমান করতে পারি। হয় সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে; নয়, মৃত বা অজ্ঞান অবস্থাতেই তার দেহ পড়েছিল লাইনের উপরে। যতক্ষণ আমরা লাশ পরীক্ষা করবার সুযোগ না পাব, ততক্ষণ এর বেশি আর কিছু জানতে পারা যাবে না। ...ওই দ্যাখো শ্রীমন্ত, পুলিশ এসে পড়েছে! চলো, ওরা কী বলে শোনা যাক।

দ্বিতীয়

স্টেশনমাস্টার একজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ ইনস্পেকটারের সঙ্গে কথা কইছিলেন। দিলীপ ও আমাকে দেখেই তাদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল এবং দুজনেই একবাক্যে জানালেন, এসব ব্যাপারে তারা বাইরের লোকের সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন।

দিলীপ এতক্ষণ আত্মপরিচয় দেননি। তিনি জানতেন, বাংলা দেশের যেসব পুলিশ কর্মচারী তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নন, তাঁরাও অন্তত তাঁর নামের সঙ্গে সুপরিচিত। তিনি তার কার্ড বার করে ইনস্পেকটারের হাতে দিলেন।

কার্ডখানা হতে করে ইনস্পেকটার নিজের মনে বিড়বিড় করে কী যেন বকতে লাগলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল ষ্ট্রেচারটা রয়েছে মেঝের উপরে—সেইভাবেই তেরপলঢাকা। কাছেই একটা বড়ো বাক্সের উপরে রয়েছে ব্যাগ ও ছাতাটা। তাদের পাশেই একটা চশমার তোবড়ানো ফ্রেম, তার কাচ নেই।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, এই চশমার ফ্রেমটা কি লাশের সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে?

স্টেশনমাস্টার বললেন, হ্যাঁ। ফ্রেমটা ঠিক লাশের পাশেই ছিল আর তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ভাঙা কাচের টুকরো।

দিলীপ নোটবুকে কথাগুলো টুকে নিলেন।

এদিকে ইনস্পেকটার লাশের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন তেরপলের আচ্ছাদন! দৃশ্যটা ভীষণ, সন্দেহ নেই। মৃতদেহটা এলিয়ে পড়ে আছে ষ্ট্রেচারের উপরে। বিচ্ছিন্ন মুণ্ড—ভাবহীন চোখদুটো দৃষ্টিহীন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে। মুণ্ডহীন দেহ অস্বাভাবিকভাবে বেঁকে রয়েছে—দেখলেই শরীর শিউরে ওঠে।

দিলীপ পূর্ণ এক মিনিটকাল ধরে নীরবে হেঁট হয়ে মৃতদেহের দিকে চেয়ে রইলেন, ইনস্পেকটার লণ্ঠনের আলো ফেললেন লাশের উপরে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, শ্রীমন্ত, আমার তিনটে অনুমানের ভিতরে দুটোকে বাদ দিতে পারি।

ইনস্পেকটার কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল দিলীপের হাতবাক্সের দিকে।

দিলীপ সেটি খুলে একজোড়া শব-ব্যবচ্ছেদে ব্যবহার করবার মতো ছোট্ট সাড়াশি বার করলেন।

ইনস্পেকটার বললেন, শব-ব্যবচ্ছেদ করবার হুকুম আমরা পাইনি।

—আমি তা জানি মশাই! আমি কেবল মৃতের মুখের ভিতরটা পরীক্ষা করব। এই বলে দিলীপ সাড়াশি দিয়ে মুণ্ডের ঠোঁট টেনে তুললেন এবং মুখের ভিতরটা ভালো করে দেখে একমনে দাঁতগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, শ্রীমন্ত, তোমার আতশিকাচখানা একবার আমাকে দাও তো!

দিলীপ কী করেন দেখবার জন্যে ইনস্পেকটার লণ্ঠন নিয়ে আগ্রহভরে ঝুঁকে পড়লেন।

দিলীপ মৃতের অসমোচ্চ দাঁতের সারির উপর দিয়ে আতশিকাচখানা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর সাঁড়াশি দিয়ে দাঁতের উপর থেকে সযত্নে খুব সূক্ষ্ম কী-একটা জিনিস তুলে নিলেন এবং আতশিকাচের ভিতর দিয়ে জিনিসটা দেখতে লাগলেন। অনেক কাল দিলীপের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এরপর তার কী দরকার হবে আমি জানি। আমি তখনই অণুবীক্ষণে ব্যবহার্য একখানা কাচের স্লাইড ও শব-ব্যবচ্ছেদের শলাকা তার দিকে এগিয়ে দিলুম। তিনি সেই সূক্ষ্ম জিনিসটা স্লাইডের উপরে রেখে শলাকা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ততক্ষণে আমি অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা প্রস্তুত করে রাখলুম।

দিলীপ বললেন, একফোঁটা Farrant আর একটা cover-glass দাও।

দিলুম।

দিলীপ তার অণুবীক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। আমি ইনস্পেকটারের মুখের দিকে তাকালুম—তাঁর মুখে বিদ্রূপহাস্য! আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন–বোধহয় ভদ্রতার অনুরোধেই!

অপ্রস্তুতভাবে তিনি বললেন, এসব আমার বাহুল্য বলে মনে হচ্ছে মশাই! ভদ্রলোকটি মারা যাবার আগে কি খেয়েছিলেন, সেটা জেনে কিছু লাভ আছে কি? আমার বিশ্বাস, ভদ্রলোক কুখাদ্য খেয়ে মারা পড়েননি।

দিলীপ সহাস্যে মুখ তুলে বললেন, মশাই, এ-শ্রেণির মামলায় কিছুই বাহুল্য নয়। প্রত্যেক তথ্যেরই কিছু-না-কিছু মূল্য আছে।

ইনস্পেকটার দমলেন না, বললেন, যার মুণ্ড কাটা গেছে, তার শেষ-খাবারের কথা জেনে কোনওই লাভ নেই।

—তাই নাকি? যে অপঘাতে মারা পড়েছে, তার শেষ খাবারের কথাটা কি এতই তুচ্ছ? মৃতের ফতুয়ার গায়ে এই যে গুড়ো গুড়ো কী জিনিস লেগে রয়েছে, দেখছেন? এথেকে আমরা কি কিছুই জানতে পারব না?

ইনস্পেকটার অবিচলিতভাবে বললেন, এমন কী আর জানতে পারবেন?

দিলীপ প্রথমে নিরুত্তর হয়ে মৃতের ফতুয়ার উপর থেকে সাঁড়শির সাহায্যে গুড়োগুলো একে একে তুলে নিলেন। তারপর সেগুলো স্লাইডের উপরে রেখে অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করলেন।

তারপর মুখ তুলে বললেন, এই জানা যাচ্ছে যে, ভদ্রলোক মারা যাবার আগে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট খেয়েছিলেন।

ইনস্পেকটার বললেন, আমার মতে, ও কথা না জানলেও চলত। মৃত কী খেয়েছিলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনওই দরকার নেই। এখানে একমাত্র

প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা মারা পড়েছে কেন? সে কি আত্মহত্যা করেছে? দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে? না কেউ তাকে খুন করেছে?

দিলীপ বললেন, মাপ করবেন মশাই! একমাত্র যে প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে না তা হচ্ছে এই—লোকটিকে খুন করেছে কে? আর কেনই বা খুন করেছে? অন্য সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে—অন্তত আমি পেয়েছি!

ইনস্পেকটার সবিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন— সে দৃষ্টি ছিল অবিশ্বাসের ছায়াও ।

অবশেষে বললেন, মামলার কিনারা করে ফেলতে আপনার দেরি লাগেনি দেখছি! তার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ভাব।

দিলীপ দৃঢ়স্বরে বললেন, দেরি লাগবার কথা নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে খুনের মামলা। খুনের কারণ আন্দাজ করাও শক্ত নয়। মণিলাল বুলাভাই ছিলেন নামজাদা জহুর আর খুব সম্ভব তার সঙ্গে অনেক দামি পাথরও ছিল। আপনি বরং মৃতের পোশাক একবার খুঁজে দেখুন।

মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে ইনস্পেকটার বললেন, এ হচ্ছে আপনার বাজে আন্দাজ। মৃতব্যক্তি জহুরি ছিলেন, তার সঙ্গে দামি পাথর ছিল, অতএব ধরে নিতে হবে তিনি খুন হয়েছেন? এও যুক্তি নাকি?

তিরস্কার-ভরা কঠিন দৃষ্টিতে অল্পক্ষণ দিলীপের দিকে চেয়ে থেকে আবার বললেন, 'মৃতের জামাকাপড় খোঁজার কথা বলছেন? হ্যাঁ, আমরা এসেছি সেইজন্যেই। মনে রাখবেন মশাই, এটা হচ্ছে বিচারাধীন মামলা—খবরের কাগজের পুরস্কার-প্রতিযোগিতা নয়!' বলেই তিনি সদর্পে আমাদের দিকে পিছন ফিরে লাশের পোশাকের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এবং যা যা পেলেন, বড়ো বাক্সটার উপরে ব্যাগের পাশে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

এদিকে দিলীপ পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন লাশের সমস্ত দেহটা নিয়ে। বিশেষভাবে আতশিকাচ তিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন মৃতের পাদুকা।

ইনস্পেকটার মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকান আর তার মুখ হয়ে ওঠে কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল।

তারপর নিজের কাজ সেরে ফিরে বললেন, আমি হলে মশাই, খালি চোখেই জুতোটা দেখতে পেতুম! (সহস্যে স্টেশনমাস্টারকে ইঙ্গিত করে) তবে আপনি হয়তো খালি চোখে ভালো দেখতে পান না!

দিলীপ কিছু বললেন না, মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

তারপর তিনি বড়ো বাক্সটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, মৃতের জামাকাপড়রে ভিতর থেকে কী কী জিনিস পাওয়া গিয়েছে।

মানিব্যাগ, পকেটবুক, একখানা চশমা (বোধহয় লেখাপড়ার জন্যে), পকেট ছুরি, দেশলাইয়ের বাক্স, তামাকের রবারের থলি ও কার্ডকেস প্রভৃতি ছোটো ছোটো আরও দুএকটি জিনিস।

দিলীপ প্রত্যেক জিনিসটা ভালো করে উলটে-পালটে পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং ইনস্পেকটার তাকে লক্ষ করতে লাগলেন কৌতুক ও অবহেলাপূর্ণ চোখে।

দিলীপ চশমার কাচ দু-খানা আলোর বিরুদ্ধে রেখে তাদের শক্তি পরীক্ষা করলেন। থলি থেকে তামাকের গুড়ো তুলে দেখলেন। সিগারেট পাকবার কাগজ ও দেশলাইয়ের বাক্সটাও তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াল না।

ইনস্পেকটার বললেন, তামাকের থলি নিয়ে এত নাড়াচাড়া করছেন, ওর ভেতরে আপনি কী দেখতে চান?

—তামাক । এর ভেতরে ষ্টেট এক্সপ্রেস তামাক রয়েছে।

—তাও বুঝতে পেরেছেন?

—পেরেছি। বাজারে যেসব তামাক চলে তা দেখলেই আমি বলে দিতে পারি সেগুলোর নাম কী? এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি অনেক পরীক্ষার পর।

—আপনার বাহাদুরি আছে।

—বিনয় দেখাবার জন্যে সেটা অস্বীকার করতে চাই না। ...কিন্তু আপনি দেখছি মৃতের পকেট থেকে দামি পাথর-টাথর কিছুই পাননি।

—না। ওসব কিছু ছিল বলেও মনে হয় না। তবে দামি পাথর না পেলেও দামি জিনিস পেয়েছি বটে। সোনার ঘড়ি আর চেন, একটি গলাবন্ধের হিরার পিন, দু-খানা একশো আর চারখানা দশ টাকার নোট। বুঝতেই পারছেন, খুন হলে খুনি এসবের মায়া ত্যাগ করত না! আপনার খুনের মামলা ফেঁসে গেল—কী বলবেন মশাই?

দিলীপ বললেন, ওই ভেবে আপনি যদি খুশি হতে চান, খুশি হোন! কিন্তু আমার মত একটুও বদলায়নি। এইবারে কি ঘটনাস্থলটা দেখা উচিত নয়?

—'চলুন।

—হ্যাঁ, আর এক কথা। মালগাড়ির ইঞ্জিনটা কি ভালো করে পরীক্ষা করা হয়েছে?

স্টেশনমাস্টার বললেন, হ্যাঁ। সামনের আর পিছনের চাকায় রক্তের দাগ লেগে আছে।

দিলীপ বললেন, দেখা যাক, রেললাইনেও রক্তের দাগ পাওয়া যায় কি না!

আর প্রশ্ন করবার অবসর দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন—আমাদেরও পাত্তাড়ি গুটোতে হল।

দিলীপ নিজেও একটা লণ্ঠন চেয়ে নিলেন। তার হাতে রইল লণ্ঠন, আমার হাতে তার বাক্স। ইনস্পেকটার আর স্টেশনমাস্টার যেতে লাগলেন আগে আগে।

আমি চুপিচুপি বললুম, দিলীপ, আমি এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। তুমি তো দেখছি এরই মধ্যে একটা সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছ! এ ব্যাপারটাকে তুমি আত্মহত্যা না বলে হত্যা বলছ কেন?

দিলীপ উত্তরে বললেন, প্রমাণ খুব ছোটো, কিন্তু অকাট্য। মৃতের বা রগের উপরে মাথার চাঁদিতে একটা ক্ষত আছে, তুমি দেখেছ? ইঞ্জিনের আঘাতে ওরকম ক্ষত হলেও হতে পারে। কিন্তু এই ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়েছে—আর অনেকক্ষণ ধরেই পড়েছে! ক্ষত থেকে নেমে এসেছে দুটো রক্তের ধারা। দুই ধারার রক্তই ডেলা বেঁধে আর আংশিকভাবে শুকিয়ে গিয়েছে। মনে রেখো, এটা হচ্ছে ছিন্নমুণ্ড। আর এই ক্ষতের জন্ম হয়েছে নিশ্চয়ই মুণ্ডচ্ছেদের আগে, কারণ যেদিক থেকে ইঞ্জিনটা আসছিল, ক্ষতটা সেই দিকে নেই। তারপর ভেবে দ্যাখো, ছিন্নমুণ্ডের ভিতর থেকে এ রকম রক্তপাত হয় না। অতএব মুণ্ডচ্ছেদের আগেই এই ক্ষতের সৃষ্টি।

ক্ষত থেকে শুধু রক্ত পড়েনি—রক্তের ধারা হয়েছে দুটি। প্রথম ধারাটি মুখের পাশ দিয়ে বয়ে জামার কলারকেও রক্তাক্ত করে তুলেছে। দ্বিতীয় ধারাটি ক্ষত থেকে চলে গিয়েছে মাথার পিছন দিকে। শ্রীমন্ত, নিশ্চয়ই তুমি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম মানো? রক্ত যদি চিবুকের দিকে নেমে গিয়ে থাকে—প্রথম ধারায় যা হয়েছে—তাহলে বলতে হবে, মণিলাল তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর রক্ত যদি সমুখ থেকে মাথার পিছন দিকে গড়িয়ে গিয়ে থাকে—দ্বিতীয় ধারায় যা হয়েছে—তাহলে বলতে হবে, মণিলাল তখন উপরদিকে মুখ তুলে চিত হয়ে শুয়েছিল।

এখন ড্রাইভারের কথা মনে করো। সে দেখেছে, মণিলাল মাটির দিকে মুখ করে উপুড় হয়ে লাইনের উপরে শুয়েছিল। এক্ষেত্রে রক্তের একটা ধারা বাঁ গাল বয়ে কলার পর্যন্ত এবং আর একটা ধারা মাথার নীচে থেকে উপরে উঠে পিছন দিকে নেমে আসতে পারে না। আসল ব্যাপার কী হয়েছে জানো? মণিলাল যখন সোজা হয়ে বসে বা দাঁড়িয়েছিল, তখন কেউ আঘাত করেছিল তার মাথার উপরে—আর রক্তের প্রথম ধারা নেমে এসেছিল তার গাল বয়ে। তারপর সে

চিত হয়ে মাটির উপরে পড়ে যায়, আর রক্তের দ্বিতীয় ধারা চলে যায় তার মাথার পিছন দিকে।

—দিলীপ, আমি ভারী বোকা লোক! এসব কিছু ভাবতে বা লক্ষ করতে পারিনি। অভ্যাস না থাকলে কেউ তাড়াতাড়ি অনুমান বা পর্যবেক্ষণ করতে পারে না! ..আচ্ছা শ্রীমন্ত, মৃতের মুখ দেখে তোমার কোনও কথা মনে হয়েছে?

—হয়েছে। মনে হয়, ও যেন শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার দরুন মারা পড়েছে।

—ঠিক বলেছ। ও মুখ হচ্ছে শ্বাসরুদ্ধ হওয়া মানুষের। তুমি বোধহয় আরও লক্ষ করেছ, ওর জিভ ফোলাফোলা, আর ওর উপর ঠোঁটের ভিতরে দাঁত বসে যাওয়ার দাগ— তার কারণ মুখের উপরে পড়েছিল প্রবল চাপ। এখন এইসব তথ্য আর অনুমানের সঙ্গে মাথার ক্ষতের কথা মিলিয়ে দ্যাখো। খুব সম্ভব, মণিলাল মাথায় আঘাত পাবার পর হত্যাকারীর সঙ্গে যোঝাযুঝি করেছিল, তারপর হত্যাকারী তার মুখ চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে তাকে মেরে ফেলে।

আমি চমৎকৃত হয়ে নীরবে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলুম!

তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, মৃতের দাঁতের ভিতর থেকে সাঁড়াশি দিয়ে কী বার করে নিয়েছিল? অণুবীক্ষণে সেটা দেখবার সুযোগ আমি পাইনি।

দিলীপ বললেন, ও, সেটা তুমি জানতে চাও? তার দ্বারা আমাদের অনুমান আরও বেশি অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। সেটা হচ্ছে একগোছা বোনা কাপড়ের অংশ। অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে দেখে বুঝেছি আলাদা আলাদা তন্তুর দ্বারা তা বোনা হয়েছে, প্রত্যেক তন্তুর রং ভিন্ন। তার বেশির ভাগই হচ্ছে রাঙা পশমি তন্তু। সেই সঙ্গে তার মধ্যে আছে কাপড়ের নীলরঙা তন্তু, আর কতকগুলো হচ্ছে হলদে পাটের। এটা হয়তো কোনও মেয়ের রঙিন কাপড়ের অংশ। তবে পাট আছে বলে সন্দেহ হয়, হয়তো এটা কোনও পর্দা বা কম দামি অন্য কিছুর অংশ।

—এ থেকে কী বুঝতে হবে?

—যদি এটা পরনের কাপড়ের অংশ না হয়, তবে বুঝতে হবে এটা এসেছে কোনও আসবাব থেকে। আর আসবাব মানেই বোঝায় গৃহস্থালি!

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম, এ যুক্তি অকাট্য বলে মনে হচ্ছে না!

—না। কিন্তু এর দ্বারা আমার একটা মত রীতিমতো সমর্থিত হচ্ছে।

—কী!

—মৃতের জুতোর তলা দেখে আমি যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। খুব ভালো করে জুতোর তলা পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু তাতে বালি, কাঁকর, মাটি বা টুকরো ঘাসের কোনও চিহ্নই পাইনি। অথচ মৃতকে রেললাইনের উপরে আসবার জন্যে নিশ্চয়ই এবড়োখেবড়ো মাঠ পার হয়ে আসতে হয়েছে—কারণ ঘটনাস্থলের আশেপাশে নাকি কোনও রাস্তা নেই। তার বদলে জুতোর তলায় পেয়েছি তামাকের ছাই আর একটা পোড়া দাগ—যেন সেই জুতো দিয়ে কোনও জ্বলন্ত চুরোট বা সিগারেট মাড়ানো হয়েছে। জুতোর তলায় একটা পেরেক একটু বেরিয়ে পড়েছিল, তার ডগায় লেগেছিল একটুখানি রঙিন তন্তু—তা কার্পেটের অংশ ছাড়া কিছুই নয়। এর দ্বারা বেশ বোঝা যাচ্ছে, লোকটি মারা পড়েছিল কোনও কার্পেটপাতা ঘরের ভিতরে। তার জুতোর তলায় সেই ঘরে ঢোকবার আগে যেসব দাগ ছিল, কার্পেট বা পাপোশের সংঘর্ষে সব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপর ঘর থেকে সে আর পায়ে হেঁটে বেরোয়নি—কারণ মৃত্যুর পর কেউ পায়ে হাঁটতে পারে না। নিশ্চয় কেউ তার মৃতদেহ বহন করে রেললাইনের উপরে রেখে এসেছিল।

আমি একেবারে নীরব হয়ে রইলুম। দিলীপের সঙ্গে আমার পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ, তবু যতবারই তার সঙ্গে যাই, ততবারই আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে নতুন নতুন বিস্ময়! অতি তুচ্ছ সব তথ্য থেকে তিনি সকল দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এমন একটি সত্যিকার ও অপূর্ব গল্প খাড়া করে তোলেন, যা শুনলে পরম বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না; মনে হয় দিলীপ যেন মায়াবী!

অবশেষে আমি বললুম, যদি তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তাহলে তো বলতে হয় আমাদের সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল। কোনও বাড়ির ভিতরে আসল ঘটনাস্থল হলে সেখানে নিশ্চয়ই আরও অনেক সূত্র পাওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন থাকল খালি একটা। সেই বাড়িটা কোথায়?

দিলীপ বললেন, হ্যাঁ, আমার মনে এখন শুধু ওই প্রশ্নই জাগছে। কিন্তু ওইটেই হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। সেই বাড়িটার ভিতরে একবার উঁকি মারতে পারলে সমস্ত রহস্যই পরিষ্কার হয়ে যায়! কিন্তু উঁকি মারি কেমন করে? আমরা খুনের তদন্ত করছি বলে বাড়ির পর বাড়ি খানাতল্লাশ করতে পারব না। আপাতত আমাদের সমস্ত সূত্রই এক জায়গায় এসে হঠাৎ ছিড়ে যাচ্ছে। ছিন্ন সূত্রের অপর অংশ আছে কোনও অজানা বাড়ির মধ্যে, আর আমরা যদি দুই সূত্রকে একসঙ্গে বাঁধতে না পারি তাহলে সমস্যার কোনও সমাধানই হবে না। কারণ আসল প্রশ্ন হচ্ছে, মণিলাল বুলাভাইয়ের হত্যাকারী কে?

—তাহলে তুমি কী করতে চাও?

—এর পরের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, কোনও বিশেষ বাড়িকে এই অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা। ওইদিকেই দৃষ্টি রেখে এখন আমাকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে আর সেইসব নিয়ে বিচার করতে হবে। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত ওই বাড়িখানাকে যদি আবিষ্কার করতে না পারি, তাহলে এদিক দিয়ে আমাদের সমস্ত অনুসন্ধানই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন বেছে নিতে হবে আবার কোনও নতুন পথ।

আমাদের কথাবার্তা আর অগ্রসর হল না। আমরা যথাস্থানে এসে পড়েছি। স্টেশন-মাস্টার দাঁড়িয়ে আছেন। ইনস্পকেটার লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে রেললাইন পরীক্ষা করছেন।

তৃতীয়

ইনস্পেকটারকে সম্বোধন করে স্টেশনমাস্টার বললেন, এখানে রক্ত পাওয়া গেছে অত্যন্ত কম। এটা বড়ো আশ্চর্য! এরকম আরও অনেক দুর্ঘটনা আমি দেখেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মাটির উপরে আর ইঞ্জিনের গায়ে দেখেছি প্রচুর রক্ত। কিন্তু এবারকার ব্যাপারে আমি অবাক হয়েছি।

দিলীপ রেললাইনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। ওখানে রক্ত আছে কি নেই, এ প্রশ্ন তার কাছে যেন নিরর্থক।

তার লন্ঠনের আলো পড়ল গিয়ে লাইনের পাশের জমির উপরে। কাঁকর-ভরা জমি এবং কাকরের সঙ্গে মিশানো রয়েছে খড়ি বা খড়ির মতন সাদা সাদা কীসের চূর্ণ।

ইনস্পেকটার তখন হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়েছেন। তার পায়ের জুতোর তলা দেখা যাচ্ছিল।

আলোটা ইনস্পেকটারের জুতোর উপরে ফেলে দিলীপ চুপিচুপি আমাকে বললেন, দেখছ?

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। ইনস্পেকটারের জুতোর তলায় লেগে রয়েছে ছোটো ছোটো কাঁকর ও সাদা সাদা চুর্ণের চিহ্ন। দিলীপের অনুমানই ঠিক। মণিলাল পদব্রজে এখানে এলে তারও জুতোর তলায় থাকত সাদা দাগ ও কাঁকর।

হেঁট হয়ে জমির উপর থেকে একটি ফাঁস-দেওয়া ফিতের মতন কী কুড়িয়ে নিয়ে ইনস্পেকটারকে ডেকে দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি মৃতের টুপিটা এখনও খুঁজে পাননি?

—না। টুপিটা নিশ্চয় কাছেই কোথাও পড়ে আছে। তারপর দিলীপের হাতের দিকে তার নজর পড়ল। তিনি মুখ টিপে হেসে বললেন, আপনি দেখছি একটা নতুন প্রমাণ হস্তগত করেছেন!

দিলীপ বললেন, হতেও পারে। এটা হচ্ছে কোনও দু-রঙা ফিতার ছোট্ট টুকরো—মাঝখানটা সবুজ, দু-পাশে খুব সরু সাদা রেখা। হয়তো পরে এটা কাজে লাগবে। অন্তত এটিকে আমি ত্যাগ করব না। তিনি পকেট থেকে একটি ছোটো টিনের বাক্স বার করলেন— তার মধ্যে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছিল খানকয় একরত্তি খাম। একখানা খামের ভিতরে ফিতার টুকরোটি পুরে খামের উপরে পেনসিল দিয়ে কী লিখলেন।

করুণাপূর্ণ হাসিমাখা মুখে ইনস্পেকটার দিলীপের কার্যপদ্ধতি লক্ষ করলেন। তারপর আবার নিযুক্ত হলেন রেলপথ পরীক্ষায়। এবারে দিলীপও যোগদান করলেন তাঁর সঙ্গে।

ইনস্পকটার চশমার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাচচূর্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, বেচারা চোখে বোধহয় ভালো দেখতে পেত না। তাই ভুলে বিপথে এসে পড়েছিল।

দিলীপ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, হবে।

একখণ্ড স্লিপারের (যে কাঠের বা তক্তার উপরে রেললাইন পাতা হয়) উপরে ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানে কাচচূর্ণগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল। দিলীপ আবার বার করলেন তার টিনের বাক্স এবং আবার বেরুল একখানা খাম ।

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, আর একবার সাঁড়াশিটা চাই। তুমিও আর একটা সাঁড়াশি নিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করো।

—কী সাহায্য?

—এই কাচের টুকরোগুলো কুড়োতে হবে।

দুজনে সাঁড়াশি দিয়ে কাচের টুকরো সংগ্রহ করতে লাগলুম।

ইনস্পেকটার বললেন, এই কাচের গুড়ো যে মৃতের চশমা থেকে পড়েছে, সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ আছে নাকি? লোকটি যে চশমা পরত, তার নাকের দাগ দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি।

—ও তথ্য যে সত্য, সেটা প্রমাণ করতে কোনও দোষ নেই। তারপর দিলীপ নিম্নস্বরে আমাকে বললেন, কাচের প্রত্যেকটি কণা কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করো।

দৃষ্টিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে তুলে কাচের কণা খুঁজতে খুঁজতে বললুম, এর কারণ আমি বুঝতে পারছি না।

দিলীপ বললেন, পারছ না? বেশ, টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। এদের মধ্যে কতকগুলো আকারে বড়ো, কতকগুলো কণা কণা। তারপর পরিমাণটাও লক্ষ করো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে-অবস্থায় চশমাখানা ভেঙেছে, তার সঙ্গে এই কাচের গুড়োগুলো ঠিক মিলছে না। এগুলো হচ্ছে পুরু নতোদর (concave) কাচ, ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেমন করে ভেঙেছে? কেবল যে পড়ে গিয়েই ভেঙেছে তা মনে হয় না। তা যদি ভাঙত তাহলে এখানে মাত্র খানকয় বড়ো বড়ো টুকরো কাচ পাওয়া যেত। এগুলো ভারী মালগাড়ির চাকার চাপেও ভাঙেনি। কারণ তাহলে কাচগুলো হয়ে যেত পাউডারের মতন আর সেই পাউডার আমরা লাইনের উপরেও দেখতে পেতুম। কিন্তু লাইনের উপরে তার কোনও চিহ্নই নেই! সেই চশমার ফ্রেমখানার কথাও ভেবে দ্যাখো। সে-ক্ষেত্রেও এমনি অসঙ্গতি। কেবল পড়ে গেলে 'ফ্রেম'খানা এত বেশি মুচড়ে ভাঙত না, আবার তার উপর দিয়ে রেলগাড়ির চাকা চলে গেলে 'ফ্রেম' খানার অবস্থা যতবেশি শোচনীয় হত, তাও হয়নি।

—তাহলে তুমি কী বলতে চাও দিলীপ?

—মনে হয়, চশমাখানা মানুষের পায়ের তলায় দলিত হয়েছে। আমাদের অনুমান যদি ভুল না হয়, তাহলে বলতে হবে, দেহটাকে যখন এখানে বহন করে

আনা হয়েছে, চশমাখানাকেও আনা হয়েছে সেই সময়ে। আর ভাঙা অবস্থাতেই। সম্ভবত, হত্যাকারীর সঙ্গে যখন মণিলালের ধস্তাধস্তি চলছিল চশমাখানা পদদলিত হয়েছিল সেই সময়ই, তারপর মৃতদেহের সঙ্গেই হত্যাকারী চশমার চূর্ণাবশেষও এখানে নিয়ে এসেছে।

আমি বোধ করি বোকার মতোই জিজ্ঞাসা করলুম, কিন্তু কেন?

—এটুকু তোমার বুঝে নেওয়া উচিত। এখন দ্যাখো। আমরা যদি এখানকার প্রত্যেক কাচ-কণা কুড়িয়ে নিয়েও দেখি পুরো চশমার কাচ পাওয়া গেল না, তাহলে বুঝতে হবে বাকি কাচচূর্ণ আছে আসল ঘটনাস্থলেই। কিন্তু আমাদের সংগৃহীত কাচের কণার দ্বারা যদি দু-খানা পরকলা সম্পূর্ণ হয় তাহলে মানতেই হবে যে, চশমাখানা ভেঙেছে এইখানেই। আমরা যখন কাচচূর্ণ সংগ্রহ করছিলুম, ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার তখন একএকটা লণ্ঠন নিয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন অদৃশ্য টুপিটাকে দৃশ্যমান করবার জন্যে।

লণ্ঠনের আলোয় আতশিকাচের সাহায্য নিয়েও আর এক কণা কাচও পাওয়া গেল না। স্টেশনমাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে ইনস্পেকটার তখন লাইন ধরে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছেন—

দিলীপ বললেন, আমাদের বন্ধুরা ফিরে আসবার আগেই এখানকার কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তারের বেড়ার কাছে চলো। ঘাসের ওপরে হাত-বাক্সটা রাখো, আপাতত ওটাই হবে আমাদের টেবিল।

বাক্সের উপরে দিলীপ আগে একখানা কাগজ পাতলেন, পাছে বাতাসে সেখানা উড়ে যায়, সেই ভয়ে চারখানা পাথর কুড়িয়ে কাগজের চার কোণে চাপা দেওয়া হল। তারপর খামের ভিতর থেকে কাচের কণা ও চূর্ণগুলোকে কাগজের উপরে ঢেলে দিলীপ কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে!

হঠাৎ তার মুখে ফুটে উঠল একটা অদ্ভুত ভাব। নিজের কার্ডকেসের ভিতর থেকে তিনি দু-খানা ভিজিটিং কার্ড বার করলেন। তারপর অপেক্ষাকৃত

বড়ো কাচের টুকরোগুলোকে একে একে বেছে নিয়ে দু-খানা কার্ডের উপরে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

চটপটে কৌশলী হাতে দু-খানা কার্ডের উপরে তিনি ডিম্বাকারে কাচের কণাগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গড়ে তুললেন প্রায়-সম্পূর্ণ দু-খানা পরকলা। দিলীপের মুখের ভাব দেখে আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। বেশ বোঝা গেল, এখনই একটা কোনও নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা!

কাগজের উপরে তখনও অনেকখানি কাচের কুচি পড়ে রয়েছে। কিন্তু তা এত সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে যে, তার দ্বারা আর কিছু গড়ে তোলা অসম্ভব।

দিলীপ হাত গুটিয়ে বসে মৃদুস্বরে হাস্য করলেন। তারপর বললেন, এতটা আমি আশা করিনি।

আমি বললুম, কী?

—তুমি কি দেখেও বুঝতে পারছ না? বড়ো বেশি পরিমাণে কাচ রয়েছে! আমরা দুখানা পরকলা প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছি, তবু এতখানি কাচের গুড়ো ব্যবহার করতে হল না।

চেয়ে দেখলুম, সত্যিই তাই! যে চূর্ণগুলো ব্যবহার করা হয়নি, তার দ্বারা হয়তো আরও দু-তিন খানা পরকলা তৈরি করা যায়! বললুম, ভারী আশ্চর্য তো! এর মানে কী?

দিলীপ বললেন, আমরা যদি বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করি, কাচের কুচিগুলোই হয়তো সঠিক উত্তর দেবে!

দিলীপ কাগজ ও কার্ড দু-খানা তুলে সাবধানে জমির উপরে রাখলেন। তারপর বাক্সের ডালা খুলে বার করলেন অণুবীক্ষণ। তারপর একখানা স্লইডের উপরে বাড়তি কাচচূর্ণগুলোকে রেখে, লন্ঠনের আলোতে অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর তিনি উচ্চস্বরে বললেন, হুঁ, রহস্যের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠল! এখানে কাচ দেখতে পাচ্ছি খুব-বেশি আর খুব-কম! অর্থাৎ এর ভিতরে চশমার কাচ আছে মাত্র দু-এক টুকরো। এই দু-এক টুকরো গ্রহণ করলেও আমাদের পরকলা দু-খানা সম্পূর্ণ হবে না; কারণ বাকি কাচচূর্ণগুলো চশমার নয়—তা হচ্ছে কোনও ছাঁচে তৈরি জিনিসের। ওগুলো কোনও নলাকার অর্থাৎ চোঙার মতন জিনিস থেকে ভেঙে পড়েছে—খুব সম্ভব কোনও গেলাসের অংশ।

স্লাইডখানা দু-এক বার সরিয়ে আবার বললেন, আমাদের বরাত ভালো শ্রীমন্ত! যা খুঁজছি, পেয়েছি! এক-একটা টুকরোর উপরে কোনও নকশার অংশ খোদা রয়েছে। এই যে আর একটা টুকরো—এর উপরে নকশার বেশ খানিকটা বোঝা যাচ্ছে! এইবার ধরতে পেরেছি। তারার নকশা আঁকা কোনও কাচের গেলাস ভেঙে এই কাচচূর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমন্ত, তুমিও একবার দেখে নাও!

আমিও অণুবীক্ষণে দৃষ্টি সংলগ্ন করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে এসে পড়লেন ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার।

কাচের গুঁড়ো, বাক্স ও অণুবীক্ষণ নিয়ে আমাদের চুপ করে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে ইনস্পেকটার উচ্চহাস্য সংবরণ করতে পারলেন না।

তারপর বোধ করি অভদ্রতা হচ্ছে ভেবেই কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে বললেন, আমি হেসে ফেললুম বলে কিছু মনে করবেন না মশাই! পুলিশের কাজে চুল পাকিয়ে ফেললুম কিনা, কাজেই এ সব যেন কেমন কেমন লাগে! অণুবীক্ষণ ভারী মজার জিনিস বটে, কিন্তু এরকম মামলায় আপনাদের একধাপও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না—পারবে কি?

দিলীপ বললেন, হয়তো পারবে না। কিন্তু ও-কথা যাক। টুপিটা কোথাও খুঁজে পেলেন?

ইনস্পেকটারের মুখ যেন চুন হয়ে গেল। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, খুঁজে পাইনি।

—আচ্ছা, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমরাও আপনাদের সাহায্য করব।

দিলীপ দু-খানা কার্ডের উপরে ফোটা কয়েক xylobalsam ফেললেন—পরকলায় কাচের কুচিগুলো যাতে স্থানচ্যুত না হয়। তারপর সমস্ত জিনিস বাক্সের মধ্যে পুরে স্টেশনমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে সবচেয়ে কাছে আছে কোন গ্রাম?

—আধ মাইলের ভিতরে কোনও গ্রাম নেই।

—রাস্তা?

—একটা নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে বটে। এখান থেকে একটু দূরে একখানা মাত্র বাড়ি আছে, রাস্তাটা তার সামনে দিয়েই গিয়েছে।

—কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি আছে?

—না। আধ মাইলের মধ্যে ওইখানেই হচ্ছে একমাত্র বাড়ি।

—আচ্ছা, তাহলে বোধহয় ওইদিকেই যাওয়া উচিত। সম্ভবত মণিলাল ওই অসম্পূর্ণ রাস্তা দিয়েই এদিকে এসেছিল।

ইনস্পেকটারও এই মতে সায় দিলেন।

চতুর্থ

পোড়োজমি। কোথাও আদুড় মাটি, কোথাও বুনো ঘাস, কোথাও কচুবন, কোথাও বিছুটির জঙ্গল। পথ বা রাস্তা নেই। ঝিঁঝিঁ ডাকছে আড়াল থেকে। জোনাকি জ্বলছে মাথার উপরে। চারিদিকে অন্ধকার—কেবল আমাদের সমুখ ও আশপাশ থেকে অন্ধকার সরে সরে যাচ্ছে—যেন আলো দেখে ভয় পেয়ে।

যেখানে ঝোপ পান, ইনস্পেকটার তার ভিতরেই পা ছোড়েন, পদাঘাত করেন—যদি তার ভিতরে হারানো টুপিটা আত্মগোপন করে থাকে!

খানিকক্ষণ পরে আমরা একখানা বাড়ির পিছনদিকে এসে দাঁড়ালুম। চারিধারে তার নিচু দেওয়াল-ঘেরা বাগান।

বাগানের পিছনকার দেওয়ালের তলায় ছিল আর-একটা বিছুটির জঙ্গল। ইনস্পেকটার তারও এখানে-ওখানে পা ছুড়তে লাগলেন!

আচমকা আর্তনাদ শুনলুম—‘ওরে বাপ রে, গেছি রে, উ-হু হু-হু!

—কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?

ইনস্পেকটার একখানা পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কাতরস্বরে বললেন, কোন হারামজাদা কোন রাসকেল, কোন গাধা বিছুটির জঙ্গলে এটা ফেলে রেখেছে?

দিলীপ হেট হয়ে জিনিসটা তুলে নিয়ে বললেন, একটা লোহার গরাদ। .এর গায়ে মর্চে-টর্চে কিছুই নেই। তার মানে বিছুটির গাদায় এ বেশিক্ষণ থাকেনি।

ইনস্পেকটার গর্জন করে বললেন, বেশিক্ষণ কি অল্পক্ষণ আমি জানতে চাই না মশাই, কিন্তু আমার ঠ্যাং আর-একটু হলেই খোড়া হয়ে যেত! ওই ডান্ডাটা যে ফেলেছে, তাকে যদি একবার হাতের কাছে পাই!

ইনস্পেকটারের দুর্ভাগ্যে কোনওরকম সহানুভূতি প্রকাশ না করে দিলীপ একমনে ডান্ডাটা পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু কেবল সেই পরীক্ষাতেই তার মন বোধ করি তুষ্ট হল না, কারণ তারপর তিনি আবার আতশিকাচ বার করে ডান্ডাটাকে আরও ভালো করে দেখতে লাগলেন।

তাই দেখে ইনস্পেকটার এত বেশি উত্যক্ত হয়ে উঠলেন যে, সে দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলেন না। খোড়াতে খোড়াতে এগিয়ে বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্টেশনমাস্টারও করলেন তার অনুসরণ–ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল তিনি আমাদের অদ্ভুত জীব বলেই মনে করছেন। অল্পক্ষণ পরেই

শুনলুম, বাড়ির সদরের কড়া ঘন ঘন নড়ছে— সঙ্গে সঙ্গে ইনস্পেকটারের হাক-ডাক!

দিলীপ বললেন, 'শ্রীমন্ত, একফোটা Farrant ঢেলে আমাকে একখানা স্লাইড দাও। এই ডান্ডার ওপরেও দেখছি গাছকয় তন্তু লেগে আছে।

আমি কথামতো স্লাইড, cover-glass, সাঁড়াশি ও শলাকা এগিয়ে দিলুম এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা রাখলুম বাগানের নিচু দেওয়ালের উপরে।

অণুবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে দিলীপ বললেন, ইনস্পেকটারের দুর্ভাগ্যের জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু ঝোপের উপরে তার পা ছোড়াটা আমাদের পক্ষে হয়েছে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক! একবার অণুবীক্ষণের ভিতরে তাকিয়ে বলো দেখি, কী দেখতে পাচ্ছ?

দেখতে দেখতে বললুম, রাঙা পশমি তন্তু, নীল কার্পাসসুতোর তন্তু, আর কতকগুলো হলদে উদ্ভিজ্জ—বোধহয় পাটের তন্তু।

দিলীপ প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ। মনে আছে তো, মণিলালের দাঁতের ভিতরেও ঠিক এই তিনরকম তন্তু পাওয়া গিয়েছে? তাহলে বোঝা যাচ্ছে, দুই ক্ষেত্রেই তন্তু এসেছে এক জায়গা থেকে। ব্যাপারটাও অনুমান করতে পারছি। যে কাপড় চাপা দিয়ে হতভাগ্য মণিলালের শ্বাসরোধ করা হয়েছিল, এই ডান্ডাটা মোছা হয়েছে বোধহয় সেই কাপড় দিয়েই! আচ্ছা, ডান্ডাটা আপাতত পাচিলের ওপরই তোলা থাক—যথাসময়ে এটা কাজে লাগবে। অতঃপর ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক, আমাদের ঢুকতে হবে এই বাড়ির ভিতরে। যে ইঙ্গিত পেলুম, তাই যথেষ্ট! এসো।

তাড়াতাড়ি জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে আমরা বাড়ির সামনের দিকে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার দাড়িয়েছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো।

ইসস্পেকটার বললেন, বাড়ির ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই, সদরে কুলুপ দেওয়া। এত ডাকলুম, এত কড়া নাড়লুম—কেউ সাড়া দিলে না। আর এখানে দাড়িয়ে থেকেই বা কী স্বর্গলাভ হবে, তা জানি না। টুপিটা নিশ্চয়ই রেললাইনের কাছাকাছি কোথাও পড়ে আছে, কাল সকালের আলোয় খুঁজে পাওয়া যাবে।

দিলীপ কোনও কথা না বলে এগিয়ে গিয়ে আরও দু-চার বার কড়া নাড়লেন।

ইনস্পেকটার বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, আমি বলছি ভিতরে কেউ নেই, তবু আপনার বিশ্বাস হল না? বলেই তিনি ক্রুদ্ধভাবে স্টেশনমাস্টারের হাত ধরে চলে গেলেন।

দিলীপ হাসিমুখে লণ্ঠন তুলে এদিকে-ওদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে করতে বাগানের ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর হেট হয়ে মাটির উপর থেকে একটা জিনিস তুলে নিলেন!

—শ্রীমন্ত, এটি হচ্ছে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ জিনিস। এই বলে দিলীপ আমার সামনে যা তুলে ধরলেন, তা হচ্ছে একটা আধ-পোড়া সিগারেট!

—শিক্ষাপ্রদ জিনিস? এর দ্বারা তুমি কী জ্ঞানলাভ করবে?

—অনেক। চেয়ে দ্যাখো, এটা হচ্ছে হাতে-পাকানো সিগারেট! বাজারে হাতে-পাকানো সিগারেটের জন্যে যে জিগ-জ্যাগ, কাগজ পাওয়া যায়, তাই এতে ব্যবহার করা হয়েছে। মণিলালেরও পকেট থেকে এই কাগজের প্যাকেট পাওয়া গিয়েছে! এইবার দেখা যাক, সিগারেটের তামাক কোন শ্রেণির!

দিলীপ একটি আলপিন দিয়ে সিগারেটের একপ্রান্ত থেকে খানিকটা তামাক বার করে নিয়ে দেখে বললেন, স্টেট-এক্সপ্রেস টোবাকো! চমৎকার! মণিলালের রবারের থলির ভিতরেও ঠিক এই তামাক পাওয়া গিয়েছে! কে বলতে পারে, মণিলালই এই সিগারেটটা নিজের হাতে পাকায়নি.....আরে, মাটিতে ওটা

আবার কী পড়ে রয়েছে? হেট হয়ে সেটা তুলে নিয়ে বললেন, একটা দেশলাইয়ের কাঠি! শ্রীমন্ত, মণিলালের পকেট থেকে কোনও মার্কার দেশলাই বেরিয়েছিল, লক্ষ করেছিলে কি?

—না।

—Wimco-এর Club Quality দেশলাই, উপরে ঘোড়ার মুখের ছবি। সে দেশলাই কিঞ্চিৎ অসাধারণ, কলকাতার বাঙালি পাড়ায় বিকোয় না, সাহেবরা খুব ব্যবহার করে। বাংলার পল্লিগ্রামেও সে দেশলাই কেউ দেখেনি। তার কাঠিগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত মোটা, Wimco-র অন্য কোনও মার্কার দেশলাইতেই অত মোটা কাঠি থাকে না। আমার হাতের কাঠিটিও তাই। এটাও যে মণিলালের দেশলাইয়ের বাক্স থেকে বেরিয়েছে, পরে মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। ...শ্রীমন্ত, আমার অত্যন্ত সন্দেহ হচ্ছে যে, মণিলালকে খুন করা হয়েছে এই বাড়ির ভিতরেই।

আমরা আবার বাড়ির খিড়কির দিকে গিয়ে হাজির হলুম।

সেখানে দাঁড়িয়ে ইনস্পেকটার অসন্তুষ্ট স্বরে স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে কথা কইছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, চলুন, এইবারে ফিরে যাই। মিছে কাদা ঘেঁটে মরবার জন্যে কেনই বা এখানে এলুম—আরে, আরে, ও কী! না, মশাই, খবরদার!

দিলীপ তখন লাফিয়ে উঠেছেন বাগানের নিচু পাঁচিলের উপরে। ইনস্পেকটারের কথা শেষ হবার আগেই তিনি ওপাশে নেমে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ইনস্পেকটার বললেন, বিনা হুকুমে পরের বাড়িতে আপনাকে আমি ঢুকতে দিতে পারি না।

দেওয়ালের উপরে মুখ তুলে দিলীপ বললেন, শুনুন মশাই, শুনুন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, মণিলাল বুলাভাই মৃত্যুর ঠিক আগেই এই বাড়ির ভিতরে এসেছিলেন—আমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। হয়তো তাকে এই বাড়ির

ভিতরেই খুন করা হয়েছে। সময় হচ্ছে মূল্যবান, দেরি করলে সমস্ত সূত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আপাতত না দেখেশুনে আমি একেবারে বাড়ির ভিতরেও ঢুকতে চাই না। এখানে দেখছি একটা আস্তাকুঁড় রয়েছে। আমি আগে ওই আস্তাকুঁড়টা পরীক্ষা করতে চাই।

পঞ্চম

ইনস্পেকটার চমকে উঠে সবিস্ময়ে বললেন, আস্তাকুঁড়! আপনি আস্তাকুঁড় ঘটতে চান? বলেন কী মশাই? আপনার মতন আশ্চর্য লোক আমি জীবনে দেখিনি! ভালো, আস্তাকুঁড় ঘেঁটে আপনার কী লাভ হবে শুনি?

—আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই আস্তাকুঁড়ের ভিতরে আমি একটা তারার নকশা-কাটা ভাঙা কাচের গেলাসের টুকরো পাব। আস্তকুড়ে বা এই বাড়ির ভিতরে ওই গেলাসের টুকরো পাওয়া যাবে বলেই মনে করি।

ইনস্পেকটার হতভম্বের মতন বললেন, ভাঙা গেলাসের টুকরোর সঙ্গে এ মামলার কী সম্পর্ক, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে কি স্টেশনমাস্টার মশাই?

স্টেশনমাস্টার বোকার মতন ঘাড় নেড়ে বললেন, উহুঁ

—বেশ, দেখা যাক দিলীপবাবুর অবাক কাণ্ডকারখানা! ইনস্পেকটারও পাঁচিল ডিঙোলেন। স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সামনেই রয়েছে একটা আস্তাকুঁড়ের মতন জায়গা—তার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সব নোংরা জঞ্জাল।

দিলীপ বাঁ হাতে লণ্ঠন নিয়ে ডান হাতে একটা কাঠি দিয়ে মিনিট খানেক জঞ্জালগুলো নাড়াচাড়া করে কতকগুলো ছোট-বড়ো কাচের টুকরো টেনে বার করে আনলেন।

তারপর ফিরে উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, দেখুন!

স্পষ্ট দেখা গেল, দুই-তিনটে বড়ো টুকরোর উপরে রয়েছে নকশা কাটা তারকা!

ইনস্পেকটার প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তিনি যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারপর বললেন, কী করে যে আপনি জানলেন কিছুই বুঝতে পারছি না! এরপর আপনি যে আরও কী ভেলকি দেখাতে চান, তাও বুঝতে পারছি না!

দিলীপ জবাব দিলেন না। নিজের মনেই আস্তাকুঁড় ঘটতে লাগলেন। সাঁড়াশি দিয়ে আরও দুই-তিনটে কাচের কুচি তুলে, ভালো করে দেখে আবার ফেলে দিলেন। একটু পরে খুঁজে খুঁজে আরও দুই-তিনটে কুচি বার করলেন, তারপর সেগুলো আতশিকাচের সাহায্যে পরীক্ষা করে বললেন, যা খুঁজছিলুম এতক্ষণ পরে তা পেয়েছি! শ্রীমন্ত, সেই কাচের কুচি বসানো কার্ড দু-খানা বার করো তো!

আমি সেই প্রায়-সম্পূর্ণ পরকলা বসানো কার্ড দু-খানা বার করে দিলুম। তারপর তার দু-দিকে রেখে দিলুম দুটো লণ্ঠনও।

দিলীপ কিছুক্ষণ সেইদিকে অপলক-চোখে তাকিয়ে থেকে আস্তাকুঁড়ে কুড়িয়ে পাওয়া কাচের কুচিকয়টা আর-একবার পরীক্ষা করতে করতে ইনস্পেকটারকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি স্বচক্ষে দেখলেন তো, এই কাচের কুচি আমি এইখান থেকে পেয়েছি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর কার্ডে বসানো পরকলার কাচ আমি কোথা থেকে পেয়েছি, তাও জানেন তো?

—হ্যাঁ মশাই। ওগুলো হচ্ছে মণিলালের চশমার কাচ! ওগুলো আপনি রেলপথ থেকে কুড়িয়ে এনেছেন।

—বেশ! এইবারে ভালো করে দেখুন।

ইনস্পেকটার ও স্টেশনমাস্টার আরও সামনের দিকে এগিয়ে এলেন, সাগ্রহে।

কার্ডের একখানা পরকলার দুই জায়গায় ও আর একখানা পরকলার এক জায়গায় ফাঁক ছিল।

দিলীপ হাতের তিনটে কাচের কুচি দু-খানা পরকলার ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে কার্ডের চশমার কাচ দু-খানা হয়ে উঠল একেবারে সম্পূর্ণ।

ইনস্পেকটার রুদ্ধশ্বাসে বললেন, হে ভগবান, এ কী ব্যাপার? ওই কাচের কুচি যে এখানে পাওয়া যাবে, কেমন করে জানলেন?

—সে কথা পরে সব শুনবেন! আপাতত আমি বাড়ির ভিতরে যেতে চাই। ওখানে গিয়ে আশা করি আমি একটা পোড়া সিগারেট বা সিগারেটের খানিকটা দেখতে পাব! আরও কী কী পেতে পারি জানেন? ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট, হয়তো Wimco-র ঘোড়ামুখওয়ালা Club Quality দেশলাইয়ের কাঠি, এমনকি হয়তো মণিলালের হারানো টুপিটাও! এখনও বাড়িতে ঢুকতে আপনার আপত্তি আছে? মনে রাখবেন, আজ বাদে কাল এলে হয়তো আমরা ওই জিনিসগুলোর কোনওটাই আর দেখতে পাব না।’

ইনস্পেকটার পুলিশের সমস্ত আইন-কানুন বিলকুল ভুলে গেলেন। বিপুল আগ্রহে বাড়ির পিছনকার দরজার উপরে ধাক্কা মেরে বললেন, ভিতর থেকে বন্ধ। ঢুকতে গেলে ভাঙতে হবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা নিরাপদ নয়।

—তবে সদরের দিকে চলুন।

—কিন্তু সেখানকার দরজায় তো কুলুপ লাগানো।

—আসুন না।

সবাই আবার পাঁচিল টপকে সদরের দিকে এলুম। দিলীপ আমাদের দিকে পিছন ফিরে সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং পকেট থেকে কী যেন একটা বার করে নিলেন।

পরমুহূর্তে দিলীপের হাতের ঠেলায় দরজাটা দু-হাট হয়ে খুলে গেল!

ইনস্পেকটার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, অ্যাঃ!

—ভিতরে আসুন।

—দিলীপবাবু, আপনি যদি চোর হতেন—

—তাহলে আপনাদের চাকরি হয়তো থাকত না। এখন ভিতরে আসুন।

দিলীপের পিছনে পিছনে আমরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলুম। ঢুকেই ডান দিকে একটি ঘর—বৈঠকখানা। একটা ঝোলানো ল্যাম্প জ্বলছে। নীচে কার্পেট পাতা। সোফা, কোঁচ ও টেবিল প্রভৃতি দিয়ে ঘরখানা সাজানো। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই।

এককোণে একটা তেপায়ার উপরে রয়েছে একটি বিস্কুটের বাক্স। তার উপরে বড়ো বড়ো ছাপানো হরফে বিস্কুটের নাম—ক্রিমক্র্যাকার।

দিলীপ আঙুল দিয়ে সেইদিকে ইনস্পেকটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ইনস্পেকটার একেবারে থ। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, অবাক কাণ্ড বাবা!

স্টেশনমাস্টার বললেন, এ বাড়িতে যে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট পাওয়া যাবে, এ কথা কে আপনাকে বললে?

—কেউ বলেনি।

—তবে কী করে জানলেন?

—খুব সহজে। শুনলে আপনি হতাশ হবেন। বলেই দিলীপ এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে ঘর ছেড়ে একটা দালানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর হেট হয়ে দুটো কী কুড়িয়ে নিলেন।

ইনস্পেকটার বললেন, কী পেলেন?

—যা পাবার আশা করেছিলুম। একটা পায়ে থাতলানো পোড়া সিগারেটের অংশ, আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি।

ইনস্পেকটার বললেন, না মশাই, এইবারে আমি হার মানলুম। এমন ব্যাপার কস্মিন কালেও দেখিনি।

দিলীপ বললেন, মণিলালের স্টেট-এক্সপ্রেস তামাকের থলি, জিগ-জ্যাগ সিগারেটের কাগজ আর কিঞ্চিত অসাধারণ দেশলাইয়ের বাক্স আপনার কাছেই আছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে তাদের সঙ্গে এখানে পাওয়া এই জিনিসগুলি মিলিয়ে দেখুন।

...ইনস্পেকটার কথামতো কাজ করে সচিৎকারে বলে উঠলেন, একই তামাক, একই কাগজ, একই দেশলাইয়ের কাঠি। দিলীপবাবু, আপনি কি জাদুকর? বাকি রইল খালি টুপিটা! সেটাও কি এখানে আছে?

—জানি না। অন্তত এ ঘরে আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে এখনও আমি হতাশ হইনি। আসুন, খুঁজে দেখি।

ঘর থেকে গেলুম দালানে। সেখানেও টুপির চিহ্ন নেই।

পাশেই আর একটি ঘর। দিলীপ উঁকি মেরে দেখে বললেন, রান্নাঘর। একবার ঢুকেই দেখা যাক না?

রান্নাঘরের চারিদিকে একবার ঘুরে উনুনের কাছে গিয়ে দিলীপ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, উনুনের ভিতরটা দেখুন। ওগুলো কী?

ইনস্পেকটার স্বহস্তে উনুনটা পরীক্ষা করতে করতে বললেন, উনুনটা এখনও তপ্ত! একটু আগেও এর মধ্যে আগুন ছিল। কয়লার সঙ্গে এখানে কাঠও পোড়ানো হয়েছিল দেখছি। কিন্তু এগুলো কী? এই ডেলা-পাকানো কালো জিনিসগুলো কাঠও নয়, কয়লাও নয়। খুনি টুপিটা উনুনে পুড়িয়ে ফেলেনি তো। কে জানে? পুড়িয়ে ফেলে থাকলে আর উপায় নেই! আপনি কাচচূর্ণ দিয়ে পরকলা খাড়া করেছেন বটে, কিন্তু খানিকটা অঙ্গার থেকে একটা আস্ত টুপি তো আর গড়তে পারবেন না? অসম্ভব আর কেমন করে সম্ভব হবে বলুন! তিনি একমুঠো কালো স্পঞ্জের মতন অঙ্গার তুলে দিলীপের সামনে ধরে দেখালেন। তারপর আবার বললেন, পারেন এথেকে একটা গোটা টুপি সৃষ্টি করতে?

দিলীপ বললেন, আবার একটা টুপি সৃষ্টি করতে যে পারব না, সে কথা বলাই বাহুল্য! তবে এটা কীসের অবশিষ্টাংশ, তা বলতে পারি। হয়তো ওর সঙ্গে টুপির কোনওই সম্পর্ক নেই। আসুন বৈঠকখানায়।

বৈঠকখানায় ফিরে এসে তিনি একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে অঙ্গারের তলায় ধরলেন। অমনি সেটা বেজায় পটপট শব্দ করে গলে যেতে লাগল এবং তাখেকে খুব ঘন ধোঁয়া উঠল—সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল একটা উগ্র গন্ধ!

স্টেশনমাস্টার বললেন, গন্ধটা বার্নিশের মতো।

দিলীপ বললেন, হ্যাঁ। গালার গন্ধ। আমাদের প্রথম পরীক্ষা সফল হয়েছে। এর পরের পরীক্ষায় কিছু সময় দরকার।

তিনি হাতবাক্সের ভিতর থেকে Marsh-এর আর্সেনিক পরীক্ষার উপযোগী একটি ছোটো ফ্ল্যাস্ক, একটি safety funnel, একটি escape tube, একটি দু-পাট তেপায়া, একটি স্পিরিট ল্যাম্প ও একটি অ্যাসবেসটসের চাক্তি বার করলেন। ফ্ল্যাস্কের মধ্যে সেই অঙ্গারীভূত জিনিসের খানিকটা ফেলে তা পরিপূর্ণ করলেন অ্যালকোহলের দ্বারা। তারপর তেপায়ার উপরে অ্যাসবেসটসের চাক্তিখানা রেখে তার তলায় স্পিরিট ল্যাম্পটি জেলে দিলেন।

দিলীপ বললেন, অ্যালকোহল গরম হতে থাকুক, ততক্ষণে আমরা আর একটি সন্দেহ মিটিয়ে ফেলতে পারি। শ্রীমন্ত, আবার এক ফোটা, Farrant ঢেলে আমাকে একখানা স্লাইড এগিয়ে দাও।

দিলুম। দিলীপ টেবিলের ধারেই বসেছিলেন। একটা ছোটো সাঁড়াশি দিয়ে টেবিলের আচ্ছাদনী থেকে একটুকরো কাপড় ছিড়ে নিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে, এই কাপড়ের নমুনা আমরা আগেই পেয়েছি।

কাপড়ের টুকরো স্লাইডের উপরে রেখে তিনি অণুবীক্ষণের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। বললেন, হ্যাঁ, ঠিক! এর সঙ্গে আমাদের আগেই চেনাশোনা হয়ে গিয়েছে—নীল পশমি তন্তু, নীল কাপাস, হলদে পাট! আচ্ছা, এবারের নমুনাকে নম্বর মেরে আলাদা করে রাখা যাক, নইলে অন্যগুলোর সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে।

ইনস্পেকটার চমৎকৃত হয়ে দিলীপের কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন। তারপর বললেন, আমি এখনও অন্ধ হয়ে আছি, কিছুই দেখতে বা ভালো করে বুঝতে পারছি না। মণিলাল কেমন করে মারা পড়েছেন, আপনি কি তা আন্দাজ করতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ। আমার অনুমান হচ্ছে, হত্যাকারী মণিলালকে যে-কোনও অছিলায় ভুলিয়ে বাড়ির ভিতরে আনে, তাকে জলখাবার খেতে দেয়। মণিলাল হয়তো আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন সেইখানেই বসেছিল। হত্যাকারী সেই লোহার গরাদ নিয়ে তাকে আক্রমণ করে, কিন্তু প্রথম আঘাতেই মণিলালকে বধ করতে পারেনি। তার সঙ্গে হত্যাকারীর ধস্তাধস্তি হয়, তারপর মণিলালকে সে টেবিলক্লথ চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। ...ভালো কথা, আর একটা মীমাংসা এখনও হয়নি। আপনি এই ফিতের খণ্ডটি চিনতে পারেন?

—হ্যাঁ, ওটি আপনি ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

—আর সেইজন্যে আপনি আমাকে ঠাট্টা করেছিলেন। যাক, আমি দুঃখিত হইনি। এখন টেবিলের টানার ভিতরে দৃষ্টিপাত করুন। ওই ফিতের কঠিমটা তুলে নিন। তারপর আমার হাতের এই ফিতের ফাঁসের সঙ্গে ওই কাঠিমের ফিতে মিলিয়ে দেখুন।

ইনস্পেকটার তাড়াতাড়ি কাঠিমটা তুলে নিলেন। দিলীপ ফিতের ফাসটা রেখে দিলেন টেবিলের উপরে।

দুই ফিতা মিলিয়ে দেখে ইনস্পেকটার বিপুল উৎসাহে বলে উঠলেন, দুটো ফিতেই এক! মাঝখানটা সবুজ—দু-পাশে সরু সাদা রেখা! বাহবা কী বাহবা! মস্তবড়ো প্রমাণ! দিলীপবাবু, না-জেনে আপনাকে ঠাট্টা করেছি বলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

দিলীপ হাসতে হাসতে বললেন, ক্ষমা প্রার্থনার দরকার নেই। ওই ফিতে নিয়ে খুনি কোন কার্যসাধন করেছিল, আন্দাজ করতে পারেন? তাকে এক লাশটা সামলাতে আর বইতে হয়েছিল। তাই হাত খালি রাখবার জন্যে নিশ্চয়ই সে ছাতা আর ব্যাগটা ফিতে দিয়ে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

স্টেশনমাস্টার বললেন, আপনি যেভাবে বর্ণনা করছেন, মনে হচ্ছে যেন আপনিও নিজে ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন। কিন্তু টুপির কী ব্যবস্থা করলেন?

দিলীপ একটি ছোট্ট নল ও একখানা কাচের স্লাইড তুলে নিয়ে বললেন, একটা মোটামুটি পরীক্ষা বোধহয় করতে পারব।

তিনি নলিকাটি ফ্লাস্কের অ্যালকোহলে চুবিয়ে স্লাইডের উপরে ধরলেন। কয়েক ফোটা অ্যালকোহল পড়ল। তারপর তার উপরে cover-glass বসিয়ে স্লাইডখানা অণুবীক্ষণযন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করলেন।

যন্ত্রে চক্ষু রেখে নিবিষ্ট মনে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, মশাই, ফেল্ট বা নেমদা কী দিয়ে তৈরি জানেন?

ইনস্পেকটার বললেন, না।

—উচ্চশ্রেণির ফেল্ট তৈরি হয় খরগোশের চুলে। গালার লেপন দিয়ে চুলগুলো বসানো হয়। যে অঙ্গার আমরা পরীক্ষা করছি তার মধ্যে গালা আছে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে বেশ কয়েক গাছা খরগোশের চুলও দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই অঙ্গারগুলো হচ্ছে কোনও ফেল্ট-হ্যাটের দগ্ধাবশেষ। খরগোশের চুলগুলো যখন রং করা নয়, তখন একথাও বলতে পারি, টুপিটার রং ছিল ধূসর।

ঠিক এই সময়ে পদশব্দ শুনে আমরা চমকে উঠে ফিরে দেখি, ঘরের ভিতরে হয়েছে একটি নূতন লোকের আবির্ভাব!

বিপুল বিস্ময়ে সে বলে উঠল, কে আপনারা? কী করছেন এখানে?

ইনস্পেকটার একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা পুলিশের লোক। তুমি কে?

পুলিশের নাম শুনেও লোকটা একটু দমল না। বললে, আমি অক্ষয়বাবুর বেয়ারা।

—এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?

—অন্য গ্রামে গিয়েছিলুম।

—কখন?

—বৈকাল থেকেই আমি বাইরে আছি।

—তোমার মনিব?

—আজ সন্ধের গাড়িতে তার কলকাতায় যাবার কথা।

—কলকাতার কোথায়?

—জানি না।’

—তিনি কী কাজ করেন?

—তাও ঠিক জানি না। তবে তিনি বোধহয় জহুরি।

—কখন ফিরবেন?

—বলতে পারি না। সময়ে সময়ে তিনি তিন-চার দিন বাড়িতে ফেরেন না।

—এ বাড়িতে আজ কোনও নতুন লোক এসেছিল?

—আমি বাড়িতে থাকতে কেউ আসেনি।

—কলকাতায় তোমার মনিবের কোনও বাসা নেই?

—জানি না। তবে শুনেছি তিনি কলকাতার বড়োবাজারে কোথায় গিয়ে ওঠেন।

দিলীপ গাত্রোত্থান করে ইনস্পেকটারকে নিয়ে দালানে গেলেন।

চুপিচুপি বললেন, এখানে আর বেশি সময় নষ্ট করবেন না, আসামি একেবারে গাঢাকা দিতে পারে। তার কার্যকলাপ দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে বিষম চতুর ব্যক্তি। অক্ষয়ের বেয়ারাকে নজরবন্দি রাখুন। বাড়িটা পুলিশের হেপাজতে থাকুক। এখান থেকে এককণা ধুলোও যেন না সরানো হয়। আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন।—ইতিমধ্যে আমরা থানায় খবর দিয়ে আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। নমস্কার।

আমরা সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

যেতে যেতে দিলীপ বললেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস অক্ষয় কালকেই ধরা পড়বে। সে যখন জহুরি, তখন তার বড়োবাজারের ঠিকানা জানা অসম্ভব হবে না। অক্ষয়ের সমব্যবসায়ীদের কেউ না কেউ তার ঠিকানা বলতে পারবে। ...তারপর শ্রীমন্ত, কর্তব্য তো শেষ হল। অতঃপর?

আমি বললুম, অতঃপর? আমি বেশ বুঝতে পারছি, এইবার তুমি তোমার হাতবাক্সের জয়গান আরম্ভ করবে!

—তাই নাকি? অসীম তোমার বোঝবার শক্তি! যাক। আপাতত ভেবে দ্যাখো, এই মামলা হাতে নিয়ে আমরা কী কী শিক্ষালাভ করলুম? ...প্রথমত, একটুও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আর ঘণ্টাকয়েক পরে এলে বাড়ির ভিতরে

ঢুকেও আমরা আর কোনও সূত্রই খুঁজে পেতুম না—সমস্তই উপে যেত কর্পূরের মতো। দ্বিতীয়ত, খুব তুচ্ছ সূত্রকেও অগ্রাহ্য করতে নেই; তাকে অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াই উচিত। দৃষ্টান্ত চাও যদি, ভাঙা চশমার কথা বলতে পারি। তৃতীয়ত, পুলিশের অনুসন্ধানকার্যে একজন শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের সাহায্য অত্যন্ত দরকারি এবং চতুর্থত, আমার এই হতবাক্সটি হচ্ছে অমূল্য নিধি; একে ছেড়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো উচিত নয়।

আমি বললুম, অতএব, জয় হাতবাক্সের জয়!

(শ্রীমন্ত সেনের ডায়ারি সমাপ্ত)

অবশিষ্ট

বড়োবাজারের একটা ছোটো অন্ধকার রাস্তা—চার-পাঁচ হাতের বেশি চওড়া নয়। কিন্তু তার মধ্যে প্রতিদিন জনস্রোত যেন উপছে পড়ে। প্রত্যহ কত হাজার লোক যে সেখান দিয়ে আনাগোনা করে, কেউ তার হিসাব রাখেনি।

রাস্তা সরু হলে কী হয়, দু-পাশের বাড়িগুলোর অধিকাংশই পাঁচ-ছয় তলার কম নয়। যেন নীচে আলোকের অভাব দেখে মুক্ত আকাশ-বাতাসকে খোঁজবার জন্যে তারা উপরে— আরও উপরে ওঠবার চেষ্টা করেছে।

প্রত্যেক বাড়ির তলায় তলায় যেন পায়রার খোপের পর খোপ সাজানো হয়েছে। এইসব খোপে যারা বাস করে, তাদের মধ্যে বাঙালির দেখা পাওয়া যায় না।

অথচ এমনি একখানা মস্তবড়ো বাড়ির সব উপর তলার একটি ঘরে চৌকির উপরে যে বসে আছে, সে আমাদের অক্ষয় ছাড়া আর কেউ নয়।

শহরে এত জায়গা থাকতে এখানে এসে কেন যে সে বাসা বেঁধেছে তা বলা কঠিন। হয়তো তার অসাধু—কিন্তু সুচতুর মন বুঝেছে, চৌর্য-ব্যবসায় কোনওদিনই নিরাপদ নয়; বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও যে-কোনও বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা; পুলিশকে ঠকাবার জন্যে যারা নির্জন জায়গায় আশ্রয় নেয়, তারা হচ্ছে নির্বোধ, কারণ পুলিশের দৃষ্টি সর্বাগ্রে তাদেরই আবিষ্কার করতে পারে; কিন্তু জনতাসাগরে হারিয়ে গেলে সহজেই কেউ তার পাত্তা পাবে না!

এইটেই তার বড়োবাজারে বাসা নেবার একমাত্র কারণ কি না জানি না; কিন্তু সেই অন্ধকার রাস্তার এই ছ-তলা বাড়ির উপর তলায় সত্যসত্যই বাসা বেঁধেছিল আমাদের অক্ষয়। কলকাতায় এলে সে এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করত।

অক্ষয় চৌকির উপরে বসে আছে। ঘরের অন্য সব দরজা-জানলা বন্ধ। কেবল একটি খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে আসছে অপরাহ্নের রৌদ্রপীত আলো এবং বড়োবাজারের বিপুল মানব-মধুচক্রের অশ্রান্ত গুঞ্জন।

তার সামনে একখানা কাগজের উপরে ছড়ানো রয়েছে নানা রঙের নানা আকারের রত্ন। হিরা, পান্না, চুনি, মরকত, মুক্ত প্রভৃতি। তাদের উপরে এসে দিনের আলো পড়ছে যেন ঠিকরে ঠিকরে!

অক্ষয় বসে বসে ভাবছে—একে একে হিসাব করে দেখলুম, এগুলোর বাজার-দর ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আশা করেছিলুম আরও বেশি লাভ হবে, কিন্তু মানুষের সব আশা সফল হয় না।

তবু যা পেয়েছি, তার জন্যে নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে পারি? নিজের বাড়িতে বসে মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা লাভ, এটা কল্পনার অতীত! যদিও মণিলালের উচিত ছিল, আরও বেশি দামের পাথর সঙ্গে করে আনা! এ তো সামান্য চুরি নয়, আমাকে দস্তুর মতন নরহত্যা করতে হয়েছে। নরহত্যায় আরও বেশি লাভ হওয়া উচিত। কারণ নরহত্যায় নিজের জীবন বিপন্ন হয়।

কিন্তু আমার জীবন কি বিপন্ন হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। ঠিকমতো মাথা খাটাতে পারলে নরহত্যার মতন সহজ আর নিরাপদ ব্যাবসা আর নেই। খুনিরা ধরা পড়ে নিজেদের বোকামির জন্যেই। তেমন বোকামি করবার পাত্র আমি নই।

পুলিশ কেমন করে আমাকে ধরবে! এমন কোনও সাক্ষী নেই যে বলতে পারে কাল সন্ধেবেলাতেই মণিলাল বুলাভাই এসেছিল আমার বাড়িতে। পুলিশ আমার বাড়িতে এলেও আমাকে সন্দেহ করলেও এমন কোনও সূত্র খুঁজে পাবে না, যার জোরে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে ।

চারদিকে দৃষ্টি রেখে ঠান্ডা মাথায় ধীরে-সুস্থে আমি কাজ করেছি। সেই সর্বনেশে টুপিটা একটু হলেই আমার নজর এড়িয়ে যেত বটে, কিন্তু যায়নি। সেও এখন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমার আবার ভয় কী?

মণিলালের লাশ পাওয়া গিয়াছে—তা তো যাবেই! নির্বোধের মতন আমি তার লাশ লুকোবার চেষ্টা করিনি। রেলগাড়ির চাকার তলায় সে কাটা পড়েছে। মণিলালের সব জিনিসই—এমনকি ছাতা আর ব্যাগ থেকে চোখের চশমা পর্যন্ত তার সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে। অতি লোভী মুখ চোরের মতন মণিলালের সোনার ঘড়ি, চেন, হিরার পিন আর নগদ দুইশো চল্লিশ টাকাও আমি নেবার চেষ্টা করিনি। পুলিশ নিশ্চয়ই স্থির করবে, মণিলাল মারা পড়েছে রেল-দুর্ঘটনায়। কিংবা সে আত্মহত্যা করেছে।

আমি নিরাপদ। আমি সাধারণ খুনি নই।

কিন্তু স্টেশনের সেই ঢাঙা লোকটা কে?

সেই যার হাতে বসন্ত নামে লোকটা মামলা তদ্বিরের ভার দিলে? লোকটা কি ডিটেকটিভ?

তার মুখ যতবারই মনে করি, ততবারই আমার বুক ধড়াস করে ওঠে কেন? সে আমার কী করতে পারে! যদিই সে এটাকে খুনের মামলা বলে ধরে নেয়, তাহলেই বা আমার ভয়টা কী? আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়? মণিলালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আবিষ্কার করবে কে?

কোনও ভয় নেই, কোনও ভয় নেই, আমার কোনও ভয় নেই! যা হবার নয়, তাই যদি হয়, তাহলেই বা আমাকে ধরবে কে? আমার কলকাতার ঠিকানা কেউ জানে না। তোড়জোড় করে তদন্ত শেষ করতেও পুলিশের বেশ কিছুদিন কেটে যাবে। আর আমি কলকাতা থেকেও সরে পড়ছি আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই। ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা আমি তুলে নিয়েছি। দূর বিদেশে অদৃশ্য হব—এখন কিছুদিনের জন্যে। আমাকে ধরবে কে?

...সিঁড়ির ওপর অমন ভারী পায়ের শব্দ কাদের? যেন অনেক লোক উপরে উঠছে একসঙ্গে! উপরতলার ঘরগুলো তো খালি। নতুন ভাড়াটে আসছে নাকি?

ঘরের দরজায় হল করাঘাত। অক্ষয় সচমকে রত্নগুলো মুড়ে পকেটে রেখে দিলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, কে?

—দরজা খুলুন।

—কে আপনি?

—দরজা খুললেই দেখতে পাবেন।

কেমন যেন বেসুরো কণ্ঠস্বর! এখানে কোনও বাঙালিই তো তাকে ডাকতে আসে না! অক্ষয় উঠল। এক-মুহূর্তে তার মুখ হয়ে গেল রক্তহীন—যেন সে নিয়তির আহ্বান শুনতে পেয়েছে!

—দরজা খোলো, দরজা খোলো বলছি?

অক্ষয় দরজা খুললেন না। দরজা থেকে তিন হাত তফাতে একটা জানলা ছিল। তারই একটা পাল্লা খুলে, বাইরে একবার উঁকি মেরেই দুম করে জানলাটা আবার বন্ধ করে দিল।

ইনস্পেকটার, পাহারাওয়ালার দল।

অক্ষয় উদভ্রান্তের মতন চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। কোনও দিকেই পালাবার পথ নেই। দরজার উপরে দুম-দাম পদাঘাত আরম্ভ হল। দরজা এখনই ভেঙে পড়বে। দাঁতে দাঁত চেপে অক্ষয় নিজের মনেই বললে, ধরা দেব? কখনও নয়, কখনও নয়। তার মুখের ভাব হয়ে উঠল ঠিক সেই রকম—মণিলালকে খুন করবার জন্যে যখন সে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল!

দুম দুম দুম—দরজায় পদাঘাতের পর পদাঘাত! ওদিকে রাস্তার ধারের বারান্দা—ওদিকেও বাইরে যাবার জন্যেও একটা দরজা!

—না, না, পালাবার পথ আছে, ওই দরজা দিয়েই আমি পালাব—ওই দরজা দিয়েই।

দুম দুম দুম দুম!

অক্ষয় উন্মত্তের মতন ছুটে গিয়ে ছ-তলা বারান্দার দরজা খুলে ফেললে।

দুম দুম—হুড়মুড় করে ঘরের দরজা ভেঙে পড়ল!

এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় একলাফ মেরে বারান্দা ডিঙিয়ে নীচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অক্ষয়ের রক্তাক্ত দেহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তার আত্মা তখন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!

সমাপ্ত